

ଯାଦ

ଜୁଲାଇ ୨୦୨୦ || ମଂଥମ ୧





সবুজ মাঠের সোনালী ছায়ায়
হাসবো মোরা প্রাণ খুলে সবাই মিলে
টেকনিক্যাল রবে আমাদের হৃদয়ের সমস্তটা জুড়ে!

কাব্য রায়
এস.এস.সি ২০১৮

পরিচালনা পর্ষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

ড. শাহ্ মোঃ আমির আলী আজাদ

উপ পরিচালক (কলেজ-১), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা



গোলাম আহমেদ ফারুক (অধ্যক্ষ, সৈয়দপুর সরকারি কারিগরী মহাবিদ্যালয়)



পৃষ্ঠপোষক

আসাদুজ্জামান (এস.এস.সি ২০১২)



প্রধান উপদেষ্টা

আবুল কালাম আজাদ (সহকারী অধ্যাপক, সৈয়দপুর সরকারি কারিগরী মহাবিদ্যালয়)



উপদেষ্টা

মোঃ মাহমুদুল হাসান (এস.এস.সি ২০১২)



সহকারী উপদেষ্টা

এম হাসান রানা (এস.এস.সি ২০১২)



সুমি আক্তার লাবনী (এস.এস.সি ২০১২)



মেহেদী ফয়সাল রেজা (এস.এস.সি ২০১৪)



সম্পাদক

আবিদ হাসান আকাশ (এস.এস.সি ২০১৬)



সহযোগী সম্পাদক

মেহেদী হাসান স্বাধীন (এস.এস.সি ২০১৬)



তানভীর ইসরাক উৎস (এস.এস.সি ২০১৭)



জামাতুল মাওয়া (এস.এস.সি ২০১৭)



প্রচ্ছদ

সাদাত মাহবুব (এস.এস.সি ২০১৬)



কলেজ প্রতিনিধি (ছেলে)

শাহ আকিফুর রহমান (একাদশ শ্রেণী)



কলেজ প্রতিনিধি (মেয়ে)

নিশাত তাসনিম (একাদশ শ্রেণী)



স্কুল প্রতিনিধি (ছেলে)

শাহরিয়ার রহমান শোভন (দশম শ্রেণী)



স্কুল প্রতিনিধি (মেয়ে)

তানজিদা আফরিন (দশম শ্রেণী)

অলঙ্করণ

ইরফান নাজিব (এস.এস.সি ২০১৬)



কম্পোজ

ইরফান নাজিব (এস.এস.সি ২০১৬)



সার্বিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধান

আতাউর রায়হান (প্রভাষক, সৈয়দপুর সরকারি কারিগরী মহাবিদ্যালয়)



মো: এরশাদ আলী মন্ডল (প্রভাষক, সৈয়দপুর সরকারি কারিগরী মহাবিদ্যালয়)



মো: সোহেল আরমান (প্রভাষক, সৈয়দপুর সরকারি কারিগরী মহাবিদ্যালয়)



আব্দুল আউয়াল (সহকারী শিক্ষক, সৈয়দপুর সরকারি কারিগরী মহাবিদ্যালয়)



পলাশ কুমার দাস (সহকারী শিক্ষক, সৈয়দপুর সরকারি কারিগরী মহাবিদ্যালয়)



মোঃ মাহমুদুল হাসান (এস.এস.সি ২০১২)



আবিদ হাসান আকাশ (এস.এস.সি ২০১৬)

ঘৰমাদকীয়

অনেকদিন পৱ সৈয়দপুর সরকারি কারিগরি মহাবিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তনদের নিয়ে এই প্রথম ম্যাগাজিন “দুরন্ত” এর পদচারণা শুরু। একটা ম্যাগাজিন প্রত্যেক টেকনিক্যালিয়ানদের প্রাণের চাওয়া ছিল। এই চাওয়াটা বাস্তবে রূপ দিতে পেরে আমরা “দুরন্ত” এর পরিচালনা পর্ষদ নিজেকে ধন্য মনে করছি।



দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে সবাই ঘরমুখী থাকার দরুন একদিকে যেমন সবাই হয়ে উঠেছে পরিবারমুখী, দীর্ঘদিন থেকেছে পরিবারের সাথে, অপরদিকে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন। সরকারি চাকুরিজীবীরা যেমন থেকেছে মহানদে, বিপরীত ঘটনা ঘটেছে দিন আনে দিন খাওয়া মানুষদের বেলায়। আর শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে কিছুটা ঘাটতি আসলেও বিশেষত স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের দিন আনন্দেই কেটেছে। একদিকে পড়াশুনার চাপ নেই, অপরদিকে নেই পরীক্ষার টেনশন। তাইতো দুইয়ে দুইয়ে চার মিলে মহা আনন্দে দিন কেটেছে বললেও ভুল হবে না। আর এই সময়টুকুই কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের প্রথম ম্যাগাজিন “দুরন্ত” বের করার পরিকল্পনা হাতে গ্রহণ করি এবং আলহামদুলিল্লাহ সফলও হই। যদিও করোনাকালীন দুর্যোগের জন্যে আমরা আমাদের এই সংখ্যাটা প্রিন্ট আকারে বের করতে পারছি না এবং এটা আমাদের প্রথম সংখ্যা বিধায় অজানা অসংখ্য ভুলভূতির জন্যে সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিছি। পরবর্তীতে আমরা এর চেয়ে আরো ভালো সংখ্যা ক্রমান্বয়ে উপহার দেয়ার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

আর অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি পরপারে পাড়ি জমানো সকল টেকনিক্যালিয়ান এবং করোনা আক্রান্ত হয়ে শহীদ হওয়া সকল ডাক্তার-নার্স-পুলিশসহ সকল শ্রেণিপেশার মানুষকে। মহান রবুল আলমিনের দরবারে দোয়া করি, করোনা আক্রান্ত সকল মানুষকে যেন সুস্থিতা দান করেন আর করোনা নামক আয়াব থেকে পৃথিবীর সবাইকে যেন মুক্তি দান করেন। আমিন।

“দুরন্ত” সৈয়দপুর সরকারি কারিগরী মহাবিদ্যালয়ের একদল বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী দ্বারা রচিত ম্যাগাজিন।

কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যৱীত যেকোন উদ্দেশ্যে এই ম্যাগাজিন এর মুদ্রণ, কোনো অংশের প্রতিলিপি তৈরি বা বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

উৎসর্গ

করোনা যুদ্ধে নিয়োজিত সকল যোদ্ধাদের।

মুচি

সে কি ভোলা যায়	ইসমত জেরিন	১২
গুড হেলথ	সাদিক ইসলাম	১৪
মহান স্বাধীনতা	জাকির ইসলাম	১৮
সৈয়দপুর সরকারি টেকনিক্যাল কলেজ ও আমার অনুধাবন	পলাশ কুমার দাস	১৯
বেওয়ারিশ	রেজওয়ান হাবিব রাফসান	২০
সুখ ছায়া	বজলুর রশিদ সুমন	২১
যেদিন থেকে আমি টেকনিক্যালিয়ান	এম হাসান রানা	২৩
TECHNICAL	মো: সাকিবুজ্জামান সাকিব	২৮
TECHNICAL	রঞ্জিনা তাসনিম তুষী	২৮
এক যে ছিল মিনা	মোহাম্মদ নাজমুস সাকিব বাপ্পি	২৯
দেবতাখুম ভ্রমণ	ওয়াহেদুজ্জামান কুশল	৩৩
ভুল	সতীর্থ কুমার দাস	৩৬
কল্প-ভাবনা	সীমান্ত সাহা	৩৬
কাঞ্চাই লেক	মোঃ মুশফিকুর রহমান প্রিভেল	৩৮
ফুটবলে টেকনিক্যাল এর সেরা অর্জন	মোঃ রেজওয়ান মিরাজ	৪০
কল্পনালতা	আশরাফুল বিন শফী রাবির	৪৩
কবিতা	রিতু সরকার	৪৪
ঘোর ও নির্বোধ লোহা	ওবায়দুল্লাহ বিন শাহেদ	৪৫
বিজ্ঞান মেলা	মেহেদী হাসান স্বাধীন	৪৭
যাত্রী	শাদমান শাহরিয়ার সিফাত	৪৯
জননী তুল্য টেকনিক্যাল	আব্দুস সবুর সৌরভ	৫২
রণক্ষেত্র	বুসরানা আলমী	৫৩
SGTC	মুশফিকুর তাসনীম	৫৫
শুরু ধ্বনন	মোঃ ওজায়ের আসিম	৫৬
প্রাণের টেকনিক্যাল	বিশাখা পোদ্দার	৫৭
সুবর্ণ জয়স্তী	জামাতুল ফেরদৌস মৌরী	৫৮
পকেট ছেঁড়া	মায়িশা বিনতে মোস্তফা	৬০
টেকনিক্যাল নিরীক্ষণ: অভিজ্ঞতা বর্ণন	মো. সোহেল আরমান	৬১
মাস্টারমশাই -১	সাদাত মাহবুব	৬৩
এইট পাশ, ফাইভ ফেল, স্বল্প শুধুই টেকনিক্যাল	মোঃ হাবিবুর রহমান	৬৪
ম্যাগাজিনের জন্য রচিত	মুজাদ্দিন ইসলাম চৌধুরী	৬৭
স্বর্ণালী অতীত: আমার চোখে টেকনিক্যাল	লাবিব শাহ	৬৯

সৈয়দপুর সরকারি কারিগরী কলেজের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ



গোলাম আহমেদ ফারুক
অধ্যক্ষ



মো: আবুল কালাম আজাদ
সহকারী অধ্যাপক (পদার্থ)



মো: আনছারুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক (গণিত)



কামরুল হোসেন
সহকারী অধ্যাপক (বাংলা)



মো: দেলোয়ার হোসেন
সহকারী অধ্যাপক (রসায়ন)



কনক কান্তি সরকার
সহকারী অধ্যাপক (উচ্চিদ বিদ্যা)



মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ
সহকারী অধ্যাপক (ইংরেজি)



মো: আতাউর রহমান
প্রভাষক (উচ্চিদ বিদ্যা)



মো: মমিনুল ইসলাম
প্রভাষক (পদার্থ)



মো: এরশাদ আলী মন্ডল
প্রভাষক (ইংরেজি)



মো: সোহেল আরমান
প্রভাষক (বাংলা)



মো. জাকিরুল ইসলাম
প্রভাষক (রসায়ন)



শাহজাদী ফাহমিদা নুচুরাত জাহান
প্রভাষক (প্রাণি বিদ্যা)



মো: আব্দুল আজিজ
প্রদর্শক (রসায়ন)



মো. আব্দুল আজিজ
প্রদর্শক (পদার্থ)



মো: ইবনে ফজল
সহকারী লাইব্রেরিয়ান

সৈয়দপুর সরকারি কারিগরী স্কুলের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ



সৈয়দা ফরিদা বানু
সহকারী প্রধান শিক্ষক



আ.ত.ম. রেজাউল করীর
সহকারী শিক্ষক



এ.বি.এম আহসান হাবীব
সহকারী শিক্ষক



মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াব্দুদ
সহকারী শিক্ষক



মো. সাদেকুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক



মো: বদরুল করিম
সহকারী শিক্ষক



মোছা: মমতাজ বেগম
সহকারী শিক্ষক



মো: আব্দুল আউয়াল
সহকারী শিক্ষক



ইসমত জেরিন মাল্লান
সহকারী শিক্ষক



মো: হাফিজুর রহমান খান
সহকারী শিক্ষক



মো: আনিতুর রহমান
সহকারী শিক্ষক



মো: মহসীন আলী
সহকারী শিক্ষক



পলাশ কুমার দাস
সহকারী শিক্ষক



মোছা: হোসনে আরা বুলবুল
সহকারী শিক্ষক



মোছা: মাহবুবা বেগম
সহকারী শিক্ষক



আ.ম.স.স. মো. আরিফুর রহমান
সহকারী শিক্ষক

সৈয়দপুর সরকারি কারিগরী শুলের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ



তানজিনা শিরিন
সহকারী শিক্ষক



মুহাদ্দিস সিদ্দিকুর রহমান
সহকারী শিক্ষক



মো: আবু সায়েম
সহকারী শিক্ষক



রীতা রানী রায়
সহকারী শিক্ষক

অফিস স্টাফদের তালিকা



মো: সোহেল রানা
প্রধান সহকারী



মো: ওমর ফারুক
অফিস সহকারী কাম: কম্পিউটার মুদ্রা:



মো. মহিদুল ইসলাম
ক্যাশিয়ার



সৈয়দ গোলাম মোস্তফা
অফিস সহকারী কাম: কম্পিউটার মুদ্রা



মো: রবিউল ইসলাম
মেকানিক্যাল: কাম-ইলেক:



মো: ইসাহাক আলী
ক্যাশ সরকার



মো: ফজলুল হক
অফিস সহায়ক



মো: রেজাউল করিম
বুকস্টার



মো: পাহুং মিয়া
ছাত্রাবাস পাহাড়াদার



মোছা: আচিয়া বেগম
অফিস সহায়ক

মে কি হোলা যায়

ইসমত জেরিন

সহকারী শিক্ষক, সৈয়দপুর সরকারি কারিগরী মহাবিদ্যালয়

সেদিন এক বন্ধুর সাথে অনেক দিন বাদে দেখা

দেখা হতেই বলে উঠলো, ভুলে গেছো নিশ্চয়ই?

আমি খানিকটা সময় নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

শৈশব, কৈশোর, ঘোবনের সৌর দীপ্তি দিনগুলো

হড়মুড় করে জীবন্ত হয়ে উঠলো যেন.. .

আমি স্পষ্ট দেখলাম আমার টায়ারের চাকা ঘোরানো শৈশব,

ঝালমুড়ি মাখা কৈশোরিক বিকেল,

মিছিলের বৈঠকে পোস্টার হাতে তারণ্যে উদ্বৃত্ত ঘোবন।

আমি তো ভুলিনি, ভুলতে পারিনি কিছুই।

ছেট হাতে হাত রেখে যে বলেছিল, বাবা বদলি হয়েছে, চলে যাচ্ছ আমরা, ভুলে যেওনা যেন, চিঠি দিও।

আজও মনে রেখেছি, ভুলে যাইনি তাকে।

ভুলতে পারিনি কান্তা দি'র জ্বলজ্বলে শিথিঁর সিঁদুর

আর হাত ভর্তি শাঁখার রিনিবিনির শব্দের বিপরীতে

দুমাস বাদে তার সাদা থান আর পৌষালি বিকেলের মত ত্রিয়মান মুখশ্রী.. . আজও ভুলতে পারিনি।

ভুলতে পারিনি, শ্রাবণ চলে যাওয়ার আগে বলেছিল, এখানে থাকিস বন্ধু, কথা আছে।

তারপর কত শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন চলে গেল.. . সে এলোন।

আজও আমি ওর পথের 'পরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করি

নিশ্চয়ই পড়ি মরি করে এসে

একদিন ঠিক বলবে ওর না বলা কথাটি।

আজও ভুলিনি রে, যে বন্ধু বলেছিল, ঘুম ভেঙে যদি দেখতাম পাটকার্তি গুলো সব সিগারেট হয়ে গেছে.. . তাকে আজও ভুলিনি।

তবে মাঝে মধ্যে খুব জানতে ইচ্ছে করতো,

তুই কি এখনও সে ইচ্ছে টা পুষে রাখিস।

এখনও ওমন করে তোকে পেয়ে বসে সিগারেটের নেশা।

এখনও নিকোটিনের ধোঁয়ায় স্বপ্ন উড়াস?

আজও ভুলিনি তোর স্বপ্ন উড়ানো এলোমেলো দিনের কথা।

আমি কিছু ভুলিনি।

আমি ভুলে যাইনি তাকেও

যে কথা দিয়েছিল, আজীবন পাশে থাকবে ছায়া হয়ে,

যদি এই জনমে সব কথা বলা শেষ নাও হয়,

তাহলে আকাশগঙ্গায় ভাসবো দুজন একই ভেলায়.. .

সময়ের আবর্তে সে কথা রাখেনি, ভুলে গেছে,

কিন্তু আমি ভুলে যাইনি, কিছুটি না।

সব মনে আছে আমার, সব.. .

আমি কিছুই ভুলে যাইনি।

ভুলে যাইনি নবান্ন উৎসব, রথের মেলা, দোলের আবীর.. .

শহরে ধূলি ধোঁয়া আর কংক্রিটের কাঠিন্য

সৃতিগুলো কে একটু হয়তো ঘোলাটে করে দেয়

আবার তার পুনঃসংস্কার করি, করতেই হয়

ওরা যে আমার অস্বিত্ব.. . অস্বিত্বকে কিভাবে অস্বীকার করি।

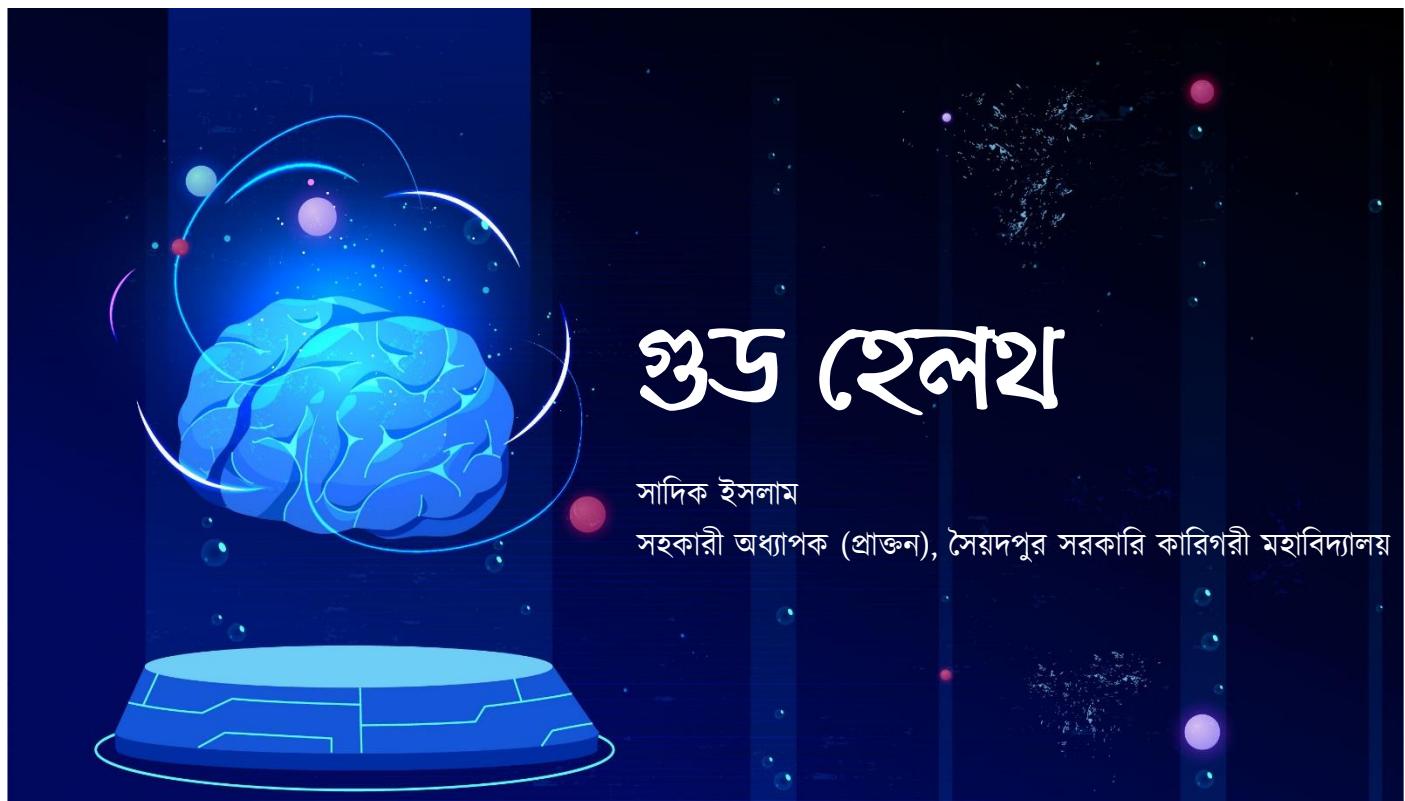
দুঃখিত বন্ধু, দেরি করিয়ে দিলাম।

শুধু জেনে যাও, জীবনের জটিলতা কে ভুলতে চেয়েছি, ভুলতে চেয়েছি আরও অনেক কিছু,

কিন্তু ভুলতে পারিনি।

ভুলে যাওয়া কঠিন বরঞ্চ মনে রাখাই সহজ।

আমি সহজ কাজটিই বেছে নিয়েছি।



গুড় ফ্লেথ

সাদিক ইসলাম

সহকারী অধ্যাপক (প্রাক্তন), সৈয়দপুর সরকারি কারিগরী মহাবিদ্যালয়

১

রিকেশের উপর দিয়ে গত রাতে একটা ঝড়ই বয়ে গেছে, কোনোদিন চিন্তা করেনি ওর ভিতরে কোনো অসুখ থাকতে পারে। সব কলিগরা যখন মাস্টলি কমপ্লিট বডি চেকাপ করায় তখন রিকেশ তার ধারে কাছেও যায়না, আর কাজ নিয়ে এতো ব্যস্ত যে নিয়মিত খাবার কথাও মনে থাকেনা। ওর বাস্তবী আরিশা ওকে তাই ফান করে নার্ড ডাকে।

গতকাল সারাদিন রিকেশ নেবুলা 005h-0Z প্রজেক্ট সারভাইভাল নিয়ে অক্ষত পরিশ্রম করেছে। গ্যালাক্সি X-Younder থেকে একটা অদ্ভুত আল্ট্রা সনিক সাউন্ড SOS সিগনাল পাঠাচ্ছে; এরপর জুপিটারে প্ল্যানেট কমান্ডার মার্ক টেল ব্যাপারটা রিকেশকে দেখার জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলো। কারণ নেবুলা ও জেডে পৃথিবী থেকে প্রেরিত একটি Trozan Troupe মহাকাশযান থেকে তিনদিন কোনো সিগনাল পাওয়া যাচ্ছিলনা। সারাদিন শেষে রিকেশ যখন দেখলো ট্রোজান একটি ব্লাকহোলের পেরিফেরিতে পড়ে SOS সিগনাল পাঠাচ্ছিল তখন কম্বাইন্ড ওয়ার্ল্ড এক্সট্রাট্রেন্স্ট্রিয়াল সেন্টার ও গ্যালিলিও প্রজেক্ট থেকে একযোগে আল্ট্রানট সায়েন্টিস্টরা অবশেষে ট্রোজানকে ব্লাকহোল ম্যাগনেটিজম থেকে রক্ষা করে। আর রিকেশের ট্রোজানকে এন্টিম্যাটার গ্যালোপ থেকে

মুক্ত করতে খুব বড় ধক্কা সামলাতে হয়েছে।

ট্রোজান স্পেসশিপ দুই হাজার ম্যাভেরিক ছাড়াও অনেক শিশু আর কিছু উৎসাহী বিজ্ঞানীদের নিয়ে গতবছর গ্যালাক্সি ট্রাভেল আর নতুন ধৰ্ম প্লানেটের সন্ধানে বের হয়েছে। তাই ব্যাপারটা পুরো পৃথিবী জাতির জন্য খুব উৎসুকের হয়ে গিয়েছিল। যাহোক রিকেশের নিরলস পরিশ্রম আর সুপার ডাইভ কসমিক ইকুয়েশন পৃথিবীতে বসে তার আলট্রা সুপার জেনারেশন এক্স কম্পিউটার ট্রোজানকে ব্লাকহোল ডিজাস্টাস থেকে বাঁচিয়েছে। সারাদিন কাজ করতে করতে কখন যে ভীষণ ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে গেছে বুঝতে পারেনি। তাই পারসোনাল স্কাই সাইকেলে ৩০০ কিলোমিটার দূরে তার বাসায় সেমি লাইট ইয়ার গতিতে তিন মিনিটে এসে উপস্থিত হয়ে সোজা রিলাক্সে চলে গেল।



টিউব টানেলে শুয়ে রিকেশ অনলাইনে গেল- আরিশার সাথে ওর মাথার উপরের সিলভার রফে হলোগ্রামে কথা বললো কিছুক্ষণ। আরিশা রিকেশকে থ্যাংকস দিল ট্রোজান উদ্বারে সফল হবার জন্য। কিন্তু রিকেশকে একটু বেশি ক্লান্ত মনে হচ্ছিল তাই বললো তোমার গলার স্বর এতো দুর্বল মনে হচ্ছে কেন রিকেশ? রিকেশ জবাব দিলো কিছুনা একটু ক্লান্ত ৬ ঘন্টা ছুটি আছে আমি আমার টিউব রুম ফুল সাইলেন্ট করে দিচ্ছি শুধু তুমি আর মা রিচ করতে পারবা ইন কেস অব ইমার্জেন্সি। আরিশা হাসলো তুমি আর ইমার্জেন্সি? তুমি কিছু কেয়ার করো। হ্রম ঘুমাও। আমি আছি তোমার প্রবলেম হলে আমার ব্রেনের মাইক্রো চিপ এন্থোস অন থাকলো ঘুমিয়ে গেলেও সিগনাল পাবো। ওকে শুভ রাত্রি বলে রিকেশ শুয়ে পড়লো।

ওদিকে আরিশা যে বাংলাদেশ থেকে রিকেশ সহ আমেরিকার স্পেস পোস্ট ডিজিটাল প্রোগ্রামে মোস্ট ব্রিলিয়ান্ট এশিয়ান হিসেবে চাঙ পেয়েছে, সারাদিন খুব বিজি সময় কাটিয়েছে। আরিশা অটো ব্রেন সিগনাল টু ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস নিয়ে কাজ করে ক্লান্ত; এটাতে আরিশা সফল হলে যুগান্তকারী এক আবিক্ষার হবে এতে করে মানুষ বসে, শুয়ে অটো ব্রেন সিগনাল দিয়ে কম্পিউটার ডিভাইসে মেমোরি ট্রাঙ্গফার করতে পারবে। মানুষ যা চিন্তা করবে কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক তাই স্টোর করে রাখবে। আজ প্রচুর এটা নিয়ে খাটাখাটি করে আরিশা ও ক্লান্ত আর ডষ্ট্রেল ৬ ঘন্টার বেশি কাজ করতে নিষেধ করেছে কিন্তু আরিশা একটানা ৯ ঘন্টা কাজ করেছে তাই রিকেশের সাথে কথা বলে সেও ঘুমিয়ে পড়েলো।

দুই ঘন্টা হবে আরিশা যার ব্রেনে একটি কমিউনিকেশন চিপ বসানো সিগনাল পেল রিকেশ প্রবলেমে। রিকেশ ঘুমিয়ে কিন্তু আরিশা রিকেশের ব্রেন চিপে চুকে দেখলো রিকেশের বিপি

খুব লো সিগনাল দিচ্ছে। এরকম কিছুক্ষণ চললে রিকেশ টেম্পোরারি কোমায় যেতে পারে! আরিশা রিকেশের পালস রেট দেখলো বিলো ৫৫! আর ফলিং ডাউন!

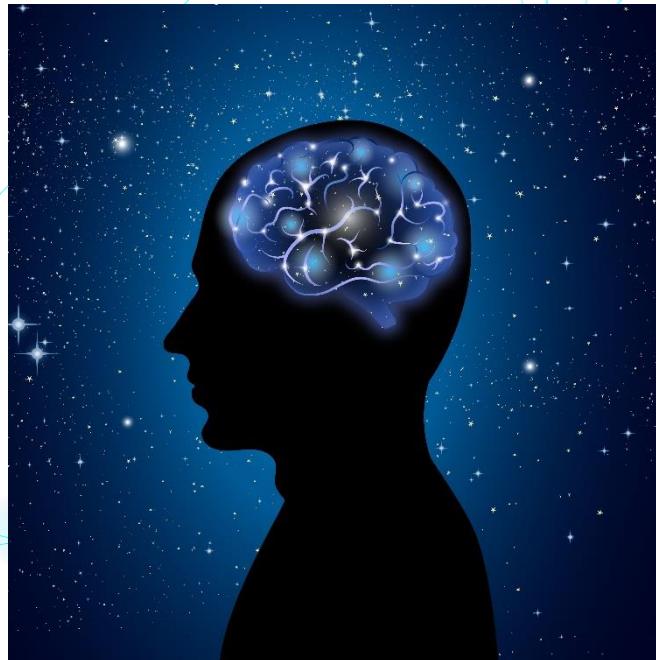
উদ্বিঘ্ন আরিশা রিকেশের ব্রেনে মাইল্ড মিউজিক সিগনাল পাঠালো কিন্তু রিকেশ উঠলোনা। আরো কয়েকবার যখন পাঠালো তখনও উঠলোনা তাই কার্ডিয়াক স্টিমুলাইজার করে বিপি বাড়াতে চেষ্টা করলো। ০.০০১ করে পালস কয়েক মিনিটে ৫৭ হলো যখন ৫৯ এ উঠলো রিকেশ একটা হালকা ঝঁকুনি দিলো এর দুই মিনিট পরে রিকেশ আস্তে চোখ খুললো।

আরিশা কয়েক মিনিট সময় নিলো। রিকেশ যখন পুরোপুরি জাগলো ওর সিলভার রফে আরিশার হাসিমাখা মুখ দেখে অবাক হলো। রিকেশ বললো কী ব্যাপার আরিশা ঘুম ভাঙালে? আরিশা প্রশ্ন করলো তোমার কেমন লাগছে? রিকেশ বললো ভালো তবে একটু দুর্বল। আরিশা বললো তুমি এখনি পামটপে বডি চেকাপ এপসে হাত রাখো। রিকেশ পামটপে ওর ডান হাতটা রাখতেই সিমুলেটর ইনটেলিজেন্সে একটা অফিসিয়াল ক্লিনিক্যাল মাল্টি ডায়াগনোসিসে ওর সব শারীরিক তথ্য চলে গেল। রিপোর্ট আসলো অল্পক্ষণের মধ্যেই হ্যাপ্রেসার খুব লো আর কিছুক্ষণ হলে শক লেভেলে চলে যেত। ক্লিনিক থেকে প্রেসার রেট, পালস রেট, সুগার, ইলেক্ট্রোলাইট, ডায়াস্টোল রিপোর্ট সব কয়েক মিনিটে পাঁচজন ডষ্ট্রের কাছে চলে গেল। ডষ্ট্রের লুইস ফ্রি ছিলেন তিনি রিপোর্ট পেয়ে সরাসরি রিকেশের হলোগ্রাম পর্দায় ভেসে উঠলেন। হাসি দিয়ে বললেন হাই মিস্টার রিকেশ আপনাকে পুরো সুস্থ লাগছে কোনো সমস্যা নেই আপনি ঘরে রাখা কম্প্রেশান বেল্টটা শরীরে পরে নিন। রিকেশ পরে নিলো, অল্পসময় কম্প্রেশানের পরে ডষ্ট্রের বললো ঠিক আছে আপনি এখন ঘুমাতে যান। ১১০/৭৫ পালস রেট ৭৫ দেখে ডষ্ট্রে খুশি হলেন। আপনার পার্সোনাল ডায়াট চার্ট আর মেডিকেশন আপডেটে আপনি হাতের পামটপ আর ব্রেন স্টোরেজে পেয়ে যাবেন; বলেই ডষ্ট্রের উধাও হলেন ওর মাথার দেয়ালের পর্দা থেকে।



আরিশা রিকেশের ডায়াট চার্ট দেখে বুবলো সুগার স্বন্নতা আর অতিমাত্রায় কাজের চাপে আর খাবার অনীহার কারণ এটি। রিকেশের অনলাইনে দেখলো সে জেগে আছে। দেখতে দেখতেই আরিশার ঘরের দেয়ালে পুরো রিকেশ ভেসে উঠলো। থ্যাংকস আরিশা সত্যিই বুঝতে পারিনি নিজের এতোটা অযুক্ত হয়েছে। আরিশা জবাব দিলো তোমাকেতো এমনি অলস বলিনা! আরিশার গলায় অস্পষ্ট অভিমান। হ্রম ছেলেরা কাঁধে পাহাড় নিয়ে হাঁটলেও মেয়েদের কাছে অলস! রিকেশ হাসিমাখা ভঙ্গিতে বললো। আরিশা বললো এখন কেমন লাগছে? রিকেশ জবাব দিলো এতো ভালো গত কয়েক বছরে লাগেনি। আরিশা বিছানায় শুয়ে পাশের দেয়ালে ভেসে ওঠা রিকেশকে দেখছে শুয়ে আছে এতো দূরে মনে হচ্ছে পাশেই। আরিশা বললো হ্রম গুড় তুমি এখন ঘুমাবে সব লাইন অফ করে পুরো রুম সাইলেন্স, কল লক করে এমনকি ব্রেনের চিপেও আমাকে অফ করে। তোমার ঘুম দরকার আর ঘুমের সময় ৬ ঘন্টা থেকে ৮ ঘন্টা করে দাও ল্যাব থেকে তোমার অসুস্থতা শুনে চিফ অব মিশন তোমাকে রেস্টের পরামর্শ দিয়েছে আর এখনি এক গ্লাস জুস কার্বোনেটেড নাও। আর শোনো কাল থেকে প্রতিদিন দুপুরে নিয়ম করে আমার সাথে লাঞ্চ করবে; এখন আমাকে আর সবাইকে অফ করে ঘুম দাও। উ হ্র রিকেশ জবাব দিল পুরো পৃথিবীর সব মানুষকে ব্রেন থেকে ফ্রিজ করে রাখলেও তোমাকে আমি অফলাইন করে রাখতে পারবোনা আরিশা। আরিশা বললো কেন পারবেনা তুমি? নির্বাঙ্গাট হয়ে ঘুম দিবে নেট খুলে রিপোর্টটা দেখ কী লেখা। দেখেছি রিকেশের জবাব; তোমাকে অফ লাইন করে রাখলে একলা যখন ঘুমাতে যাই মনে হয় আমার এই এভিয়েটের বেডটা পুরোই শূন্যে ভাসছে আর আমি ঘুম করে পড়ে যাবো। বলেই রিকেশ একটা অপূর্ব হাসি দিলো। আরিশা এই প্রথম রিকেশের এই কথা শুনে হতচকিত হলো কিন্তু কিছু উত্তর করলোনা। রিকেশের মুখের হাসি

আরো স্পষ্ট হলো। রিকেশ বাই গুড নাইট বলে বিদায় নিতে চাইলো- কিপ ইন টাচ ডোন্ট এভার বি ডিটাচড - বলে আবার হাসলো। আরিশা হাসি দিলো। ওকে শুভ রাত্রি আরিশা উত্তরে বললো - কিপ ইন গুড হেলথ! দুজনে ঘুমিয়ে পড়লো।



আরিশা ঘুমাতে গেল। রিকেশ চোখ বন্ধ করে ব্রেন চিপে সবাইকে অফ করে দেখলো আরিশার ব্রেন চিপেও সবাই অফ শুধু রিকেশ ছাড়া আর সে ঘুমিয়ে পড়েছে আর অবাক হয়ে আরিশার লাস্ট উইক হেলথ মেমোরিতে দেখলো আরিশাকেও ডেস্ট্র এক সপ্তাহের রেস্ট টাইম নিতে বলেছে কারণ অতিমাত্রায় পরিশ্রম করে আরিশা ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু আরিশা একবারও মুখ ফুটে ওর সমস্যার কথা রিকেশকে বলেনি। কিন্তু আরিশা রিকেশকে নিয়ে উদ্বিগ্ন। রিকেশের চোখ জোড়া আর্দ্র হয়ে উঠলো; আরিশাকে সময় দেয়া দরকার ভাবলো আগামীকাল দুজনে Beyond Supersonic এ করে বাংলাদেশে এক সপ্তাহ ছুটি কাটিয়ে আসবে।



জোবাইরা আফরোজ
এইচ.এস.সি ২০১৬

মহান স্বাধীনতা

জাকির ইসলাম

প্রভাষক, সৈয়দপুর সরকারি কারিগরী মহাবিদ্যালয়

হে মহান স্বাধীনতা
দিয়েছো তুমি বাঙালী জাতির অনুপ্রেরণা।

এসেছো তুমি প্রতিটি বাঙালীর দ্বারে দ্বারে
জ্বালিয়েছো প্রদীপ বাংলার ঘরে ঘরে।

ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তে
দিয়েছ স্বাধীনতা প্রতিটি বাঙালী ভক্তে।

হয়েছে পতন একান্তরের দালাল ঘারা
জানিয়েছ তুমি প্রতিটি বাঙালীর মনে সাড়।

হয়েছে পরাজয় আল-বদর আল-শামস্ আর রাজাকার
উড়িয়েছ তুমি রক্ত মাখানো পতাকা উচিয়ে তলোয়ার।

তোমার কাছে হয়েছি ঝণী বাঙালী মোরা
ভুলিনি তাদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন ঘারা।

তারা মোদের আঢ়ীয়, তারা মোদের ভাই
প্রতিটি ক্ষণে ক্ষণে মোরা তাদের তাদের স্মরণ করে ঘাই।

হে মহান স্বাধীনতা
ভুলিনি তোমায়, ভুলবো না, তুমি চির অম্লান চির অম্লান।

সৈয়দপুর সরকারি টেকনিক্যাল কলেজ ও আমার অনুধাবন

পলাশ কুমার দাস

সহকারী শিক্ষক, সৈয়দপুর সরকারি কারিগরী মহাবিদ্যালয়

আমি সরকারি চাকুরিতে যোগদান করি ২০০৫ সালে। বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয়ে চাকুরি করে অবশেষে ২০১৩ সালে সৈয়দপুর সরকারি টেকনিক্যাল কলেজে যোগদান করি। সত্যি বলতে কি, প্রথম প্রথম আমি এখানে মন বসাতে পারছিলাম না, এর পিছনে কিছু কারণ ছিল। যাই হোক, যতই দিন যাচ্ছিল ততই আমি অনুধাবন করছিলাম যে আমার ধারণাগুলো ভুল ছিল। এখানকার শিক্ষক/শিক্ষিকা ও ছাত্র/ছাত্রীরা এতটাই আন্তরিক যে বলে শেষ করা যাবে না। এখানকার প্রতিটি ছাত্র/ছাত্রী যে কতটা মেধাবী আর শিক্ষকদের প্রতি অনুরক্ত তা বলে শেষ করা যাবে না। আমি নিজে যাদের সরাসরি পাঠদান করতে পারিনি তারাও আমাকে দিয়েছে অফুরন্ত ভালবাসা আর সম্মান। আর যাদের সরাসরি পাঠদান করতে পেরেছি তাদের কথা আর নাই বা বলি। এই ভালবাসা, সম্মান, শ্রদ্ধাবোধ লুকোবার নয়। সৈয়দপুর সরকারি টেকনিক্যাল কলেজে চাকুরি করে অনুধাবন করতে পারছি শিক্ষকতাকে কেন মহান পেশা বলা হয়। আজ আমি একা নই, আমার পাশে আছে পুরো টেকনিক্যাল পরিবার। আজ আমি গর্বিত এই পরিবারের সদস্য হতে পেরে।

বেওয়ারিশ

রেজওয়ান হাবিব রাফসান
এস.এস.সি ২০১১

লাশটা একা ভিজছিল। শেষ স্টেশনে ট্রেনটা থামবার সাথে সাথেই বারো বৃষ্টিতে সব যাত্রী যখন আশ্রয় খুঁজে নিল প্লাটফর্ম এর ছাউনিতে, ট্রেনের উপরে শুয়ে থাকা লাশটা তখন ভিজছিল। বিদ্যুৎ এর বালকানিতে লাশের চেহারাটা মাঝে মাঝে পরিষ্কার হয়ে উঠছিল।

অপমৃত্যু কেস, মাথায় আঘাত। রক্ত বন্ধ হয়নি তখনো, টপটপিয়ে বরে পড়ছে প্লাটফর্ম এ। খুব বেশিক্ষণ আগের আঘাত না, ট্রেন স্টেশনে ঢোকার আগে কোন গাছের সাথে ধাক্কা লেগেছিল হয়তো। উৎসুক জনতা দূর থেকেই লাশটির দিকে তাকিয়ে আছে। বৃষ্টিতে ভিজতে থাকা ঠান্ডা, হিমশীতল লাশ। কিন্তু বেওয়ারিশের পাছে দায়িত্ব নিতে হয়, এই ভয়ে আগাছেনা কেউ। রেলপুলিশ সহ সবাই অপেক্ষা করছে বৃষ্টি থামবার।

“কিসের জন্য যে এরা ট্রেনের উপরে উঠে? আরে বাবা, টিকিটের দাম বা আর কতই? জীবনের চেয়ে কি বেশি?” - এক মধ্যবয়সীর আক্ষেপ শোনা যায়। এক কথা থেকে দশ কথা, আরো অনেক কথা হয়। আহারে! ইশ রে! ধৰনি পুরো প্লাটফর্ম জুড়ে।

লাশটা সেসব শুনছেনা, ২০-২২ বছরের বেওয়ারিশ লাশ। শুনলে প্রতিবাদ করতো ও, বলতো, ‘না না, টাকা ঠিকই ছিলো আমার কাছে। সাত মাস পর বাড়ি ফিরছিলাম, রিকশা চালাতাম ঢাকা শহরে। বেশ কিছু টাকা জমেছিল এবার। বর্ষাও এসে

পড়লো, ভেবেছিলাম ঘরের খড়ের চালটা বদলিয়ে এবার টিন লাগাবো, খড়ের চালের ফুটো দিয়ে পানি পড়ে হরদম, মনি আর ওর মায়ের কি যে কষ্ট হয়! তাই বর্ষার শুরুতেই রওনা দিয়েছিলাম, কিন্তু ছিনতাইকারী স্টেশন আসার রাস্তায় কেড়ে নিল সব! শত কাকুতিমিনতির পরও আমার কষ্টের নয় হাজার টাকা বাঁচাতে পারলাম না কিছুতেই। মূল্যে পৃথিবী অঙ্ককার হয়ে এলো আমার, ঝাপসা চোখে মনি আর ওর মায়ের অবয়ব ভেসে উঠলো শুধু। সৎবিৎ ফিরতেই খেয়াল করলাম গোপন বুকপকেটে রাখা তিনশো টাকার খোজ পায়নি ওরা। কিন্তু এই টাকা রাস্তায় খরচ করে ফেললে মনির জন্য গোপাল কাকার রসমালাই কেনা যাবে না আর। শেষবার এই রসমালাই এর জন্য খুব করে আবদার করেছিল আদরের মেয়েটা। আর মনির মা বলছিলো, পানিতে ভিজে মনির ভীষণ জ্বর। এই টাকা কটা নিয়ে বাড়ি আমাকে যে করে হোক যেতেই হতো। শেষমেশ তাই উঠে পড়লাম ট্রেনের ছাদে।”

শেষ স্টেশনে এসে পৌঁছেছিল ট্রেনটা। হয়তো এই স্টেশনেই নামবার কথা ছিল বেওয়ারিশের। বৃষ্টি এখনো ঝরছে মুষুলধারায়, খড়ের ছাদ থেকে চুইয়ে পড়া পানি বালতিতে আটকানোর চেষ্টা করছিল মনির মা। আজ মানুষটার আসার কথা, আসলে কালই তাদের ঘরে টিনের চাল দেয়া হবে। এদিকে মনির জ্বরটা বাড়ছে তো বাড়ছেই। মানুষটা কখন যে আসবে? আজ ট্রেনটা এত দেরী করছে কেন?

মুখ ছায়া

বজ্জুর রশিদ সুমন
এস.এস.সি ২০০৫

দাদু তুমি যাচ্ছ কোথায়?

চরের হাটে।

ওখানে কি গো?

পান সুপারি।

খাবে কে গো?

তোমার দাদি।

তুমি তবে?

একটু ছিটা দেয় যদি।

কেন গো দাদু?

আমার একটু বয়স বেশি।

তাতে কি গো?

তামাক পাতায় অনেক ক্ষতি।

দাদি তো বেশ ভালোই দেখি?

আছে তবে।

তবে কি গো?

তোমার দাদি বড় জেদি।

সেটা কেমন?

রাগ যদি হয় কারো সাথে

ঝাল পড়বে আমার পিঠে।

সেটাই আবার মন্দ কি গো?

না না সেটাই।

ধরলাম তবে আছ সুখে?

মোদের ছিল প্রেমের বিয়ে।

তাই বুবি?

ওদের ছিল জমিদারি

মোদের শুধু ভিটেবাড়ি।

বিয়ে যেদিন হলো শেষ

রাণী চালকে বসলো বেশ।

তারপর?

যেদিক চালায় সেদিক চলি

চেঙুর আসলে গিলে ফেলি।



আফরিন জাহান অংকন

এস.এস.সি ২০১৬

যেদিন থেকে আমি টেকনিক্যালিয়ান

এম হাসান রানা
এস.এস.সি ২০১২



১

সাদা শার্ট আর খাকি প্যান্ট পড়ে সাইকেলে চেপে কলেজের দিকে রওনা দিল ফারুক। আজকে কলেজের প্রথম দিন। বুকটা একটু ধক্কাপক করছে। ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন ছিল এরকম একটা নামি কলেজে পড়বে। আশেপাশের কয়েক জেলার মধ্যে নামকরা কলেজ। প্রতিবছর বোর্ডের সেরাদের তালিকায় থাকে। সবাই সমীহ করে চলে বিধায় এই কলেজের প্রতি আলাদা একটা টান অনুভব করত ফারুক।

সাইকেলে চেপে ধীরে ধীরে প্যাডেল ঘোরাচ্ছে ফারুক। ক্লাস নাইনে থাকতে বাবার সাথে একবার ভর্তি হবার জন্যে ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসছিল। চোখ ছানাবড়া ফারুকের। পাঁচটা সিট খালি আছে অর্থচ পরীক্ষা দিতে আসছে কয়েকশো। সেবার ফারুক শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছিল। মনের মধ্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলো কলেজে যে করেই হোক ভর্তি হবেই হবে। আজকে সেই কলেজেরই একজন ফারুক। মনে মনে একটা তৃষ্ণি অনুভব করতে করতে মেসের ছোট রাস্তা পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়েছে ফারুক।

ক্রিং ক্রিং। বেল বাজার শব্দে রাস্তার বাম পাশে সাইকেলটা চালিয়ে দিতেই পাশ থেকে সাদা শার্ট খাকি প্যান্ট পড়া আরেকজনকে দেখতে পেল ফারুক।

- কিরে মামা, এতো সকাল সকাল বের হইছিস যে, ক্লাস না দশটায়, কেবল তো সাড়ে আটটা বাজে।

চেনাজানা নাই হঠাৎ মামা ডাকে কি উত্তর দিবে ভেবে পায় না ফারুক। আবার পাশ থেকে ছেলেটি বলে উঠল,

- কিবে কথা কইস না কেন?

ফারুক আর চুপ না থেকে মজা করে বলল,

- আবায় কইছে সকাল সকাল কলেজ যাবার নাইগবে।

এ কথা বলেই একটা মুচকি হাসি দিলো। এরকম মজার উত্তর শুনে ছেলেটিও হেসে দিলো।

- তা মামা, তোর নাম কি?

: মোর মাও আদর করি কয় ফারুক। আর মোর বাপে কয় ওমর। মাইনষে ফারুক কয়া ডাকে।

- মুই আসাদ। মামার বাড়ি কোথায়?

: জাদুর হাট।

প্রথম কথায় আসাদের ভালো লেগে যায় ফারুককে। ফারুকের বাড়ি যেমন জাদুর হাটে, তেমনি কথাতেও জাদু আছে বুঝতে পারে আসাদ। দুইজনে কথা বলতে বলতে কলেজে চলে আসে ফারুক। সাইকেল গ্যারেজে সাইকেলটা রেখে ব্যাগ নিয়ে ক্লাস খুঁজতে লাগলো। যদিও তেমন বড় নয় ক্যাম্পাসটা, বিল্ডিংগুলো, তবুও অনেকগুলো ক্লাসরুম দেখে একজনকে দেখিয়ে দেয়ার জন্যে জিজেস করল ফারুক।

দেখিয়ে দেয়া ক্লাসে তুকেই দেখতে পেলো আরো কয়েকজন বসে আছে ক্লাসে। সবাই নতুন। এক বেঞ্চে দুইজন বসে গল্প করছে আর বাকিগুলো সবাই একজন একজন করে বসে আছে। ঘড়িতে তখন নয়টা বাজে। ক্লাস শুরু হওয়ার কথা দশটায়। আরো এক ঘন্টা বাকি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ফারুক। সাদা শার্ট আর খাকি প্যান্ট পড়ে একজন দুইজন করে যে যার মত ক্লাসে যাচ্ছে। সাদা ড্রেস পড়া দুই একটা মেয়েও চোখে পড়েছে ফারুকের। মেয়েগুলোর দিকে ইচ্ছে করছে তাকিয়ে থাকবে। কিন্তু মেয়েদের দেখতে কেমন যেন আতেল আতেল লাগছে। তাই মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকার ইচ্ছেটা উবে গেলো ফারুকের।

ঘড়ির কাটা যত এগুচ্ছে ক্লাসে একজন দুইজন করে সবাই আসা শুরু করছে। ঘড়ির দিকে তাকালো ফারুক। সাড়ে নয়টা বাজে। বিরাট বড় হল রুম। পেছন দিকে দুইটা দরজা। সামনের দিকে একটা। পেছন দরজার দিকে উলটো মুখ করে বসে তাকিয়ে রয়েছে ফারুক। সব অপরিচিত মুখ। একটা চেনা মুখ দরজার দিকে দেখতে যাচ্ছে। আসাদ আসছে। আসাদকে দেখে সে চিনতে পারে। সকাল বেলা তো একসাথেই আসছিল দুইজন। এতোক্ষণ আসাদ কই ছিলো, মনে মনে ভাবতেই ফারুকের কাছে এসে বসল আসাদ।

- কিরে মামা, তোর আবায় কি এতো দূরে বসতে বলছে?
স্যাররা পড়া বুঝাইলে তো বুঝতেই পারবি না।

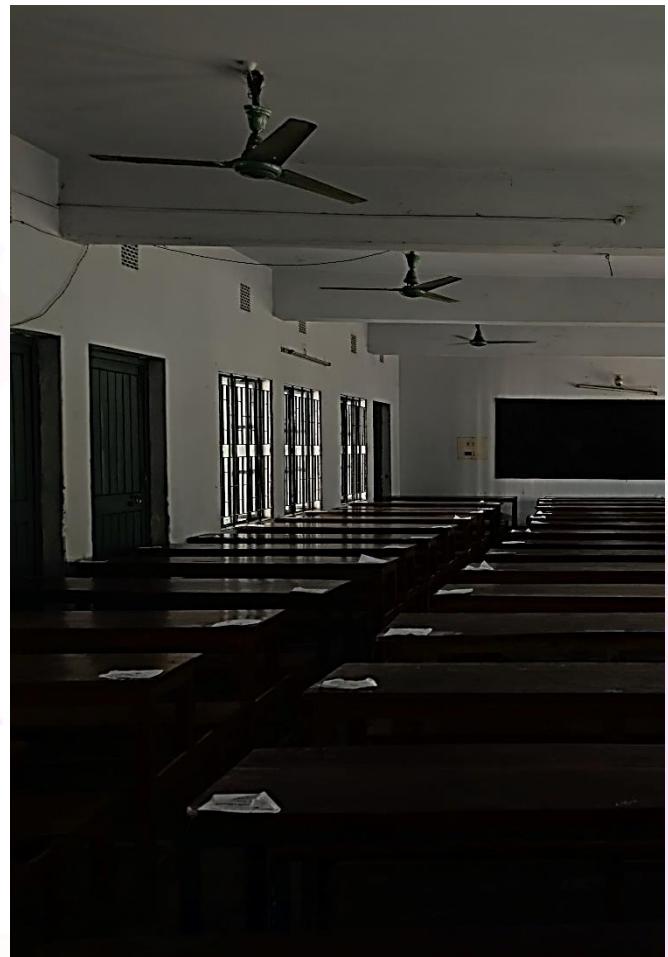
এ কথা বলেই মুচকি হাসি দিলো আসাদ। ফারুকও মুচকি হাসি দিয়ে বলল,

- উলা কথা জানা আছে। স্যার যা পড়াইবে তা তড়িৎ গতিতে বুঝি নেবার ক্ষমতা আবায় শিখি দিছে।

দুইজনই হাসতে হাসতে একে অপরের খোঁজখবর নিল।

পুরো ক্লাস ভর্তি ছাত্র-ছাত্রী। দুইশো বাইশ জন। চারজনের বেঞ্চিতে পাঁচজন ঠাসাঠাসি করে বসা। জুলাই মাস এমনিতেই ভ্যাপসা গরম। তার উপর এরকম গাদাগাদি করে বসা সবাই। মাথায় উপর ফ্যান ঘুরছে কি ঘুরছে না কিছুই ঠাওর করতে পারে না ফারুক। ঘড়ির কাটা দশটা। একে একে বেশ কয়েকজন সিনিয়র ভাইয়া আপু রুমে আসল। স্যাররাও চলে এসেছে যথারীতি। ভাইয়া আপুরা ফুল আর লিফলেট দিয়ে বরণ করে নিল নবীনদের। আজকে থেকে ফারুকও

টেকনিক্যালিয়ান হয়ে গেলো, ভাবতেই ভালো লাগছে ফারুকের। একে একে কুরআন তিলাওয়াত, বক্তব্য আর উপদেশমূলক কথাবার্তায় নবীনবরণ অনুষ্ঠান শেষ হইলো। মিষ্টি - সিংগারা - কেক দিয়ে নবীনবরণের নাস্তা সারলো সবাই। আজকের দিনের মত এখানেই শেষ ক্লাস। কালকে থেকে মূল ক্লাস।



২

সকাল দশটায় কয়েকজন বাদে সবাই মোটামুটি হাজির ক্লাসে। বেত হাতে খাটো করে দাঁড়িগোফওয়ালা মাথায় টুপি পরিহিত একজন স্যার ক্লাসে প্রবেশ করলেন। বললেন,

- জাদুধনেরা, পিটি ক্লাস আছে, চল সবাই।

এ কথা বলে বেত হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার সামনে। একে একে সবাই ক্লাস থেকে বের হয়ে মাঠে যাচ্ছে। কয়েকজনকে মাঠে না যেয়ে উলটো দিকে তড়িঘড়ি করে যেতে দেখলো ফারুক। পিটিতে এসে গরমের তীব্রতা অনুভব করলো ফারুক। এখন বুঝতে পারছে কেন ওরা পিটি না

করেই তড়িঘড়ি করে পালিয়ে গেলো। পিটি শেষ করে সবাই ক্লাসে আসলো। ঘেমে অস্থির সবাই। ঘাম শুকাতে না শুকাতেই স্যার এসে হাজির।

প্রথম দেখাতেই যে কেউ ভাববে ফ্রেন্স কাট দাঁড়ি। মাথায় দুই একটা সাদা চুলও বুবো যাচ্ছে। বয়স খুব একটা বেশি হবে না, বড়জোর আটাশ হবে। উজ্জ্বল ফরসা। অল্পভাষ্যী কিন্তু স্পষ্টভাষ্যী। সুন্দর করে বুবিয়ে কথা বলেন। পরিচয় পর্ব শেষ করতে করতে খুব দ্রুত সময়গুলো চলে গেলো। স্যারের ক্লাস শেষ হতে না হতেই আরেকজন স্যার এসে হাজির। মুখে সুন্দর হাসি লেগেই আছে এনার। সবসময় ভাই ভাই বলে সম্মোধন। ফারুকের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল,

- এ ভাই, তুই দাঁড়া, নাম কি তোর?

: স্যার, ফারুক। ওমর ফারুক।

- বাড়ি?

: জাদুর হাট।

জাদুর হাট শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। স্যারও মুচকি হেসে হাসিতে যোগ দিলেন।

- গোল্ডেন নাকি প্লাস?

: স্যার গোল্ডেন।

- বড় হয়া কি হবু?

: স্যার, আবার ইচ্ছা ডাক্তার হই কিন্তু আমার ইচ্ছা একটা পলিটিক্স করবো।

- আচ্ছা, বইস।

একে একে সবার কাছ থেকে নাম পরিচয় জেনে নিয়ে অনেক দামি দামি কথা বললেন।

ঘড়িতে তখন বারোটা দশ মিনিট। স্যার যাওয়ার সময় হয়েছে। কথা শেষ করতে না করতেই আরেকজন স্যার এসে হাজির। ক্লাস শেষ করে চলে গেলেন।

পরের ক্লাসের স্যারও আসলেন। যথারীতি স্যারও পরিচয়পর্ব শেষ করলেন। সবার সাথে কথা বলতে বলতে পড়িয়ে ফেললেন পদার্থের রাশি অধ্যায়টি। ভেষ্টের রাশি, ক্লেলার

রাশি। যার কোনো দিক নাই কিন্তু মান আছে তা ক্লেলার রাশি। আর যার দিক ও মান উভয়েই আছে তা ভেষ্টের রাশি। খুব সুন্দর ভাবে বুবিয়ে ক্লাস শেষ করলেন স্যার। ফারুকের মনে একটা তৎপর ছোঁয়া। এতো সুন্দর করে সব স্যাররা পড়ান বিধায় এই কলেজের এতো সুনাম।

ঘড়িতে কাটায় কাটায় একটা বাজে। টিফিন নিয়ে দরজার সামনে চলে এসেছে মমিন। স্যার সবাইকে ভালো থাকো আবার কালকে দেখা হবে বলে টিটার্স কমনরুমে চলে গেলেন। আর বাকীরা সবাই একটা একটা করে টিফিন নিয়ে বের হচ্ছে। একজনকে সামনের দরজা দিয়ে টিফিন নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখলো ফারুক।

- কিরে শুশ্রের বেটা, তোর ওইটা প্যাট নাকি তাজিরের ডেক?

ফারুকের এমন মজার কথায় কিছুটা ভড়কে গেল শান্ত। ফারুকের দিকে তাকিয়ে শান্তও একটা মুচকি হাসি দিয়ে বলল,

- খুব ক্ষুধা লাগছে রে মামা। সকালে কিছু খাই নাই।

- নে ধর, মোরটাও খা।

সিঙ্গারাটা শান্তর দিকে বাড়িয়ে দিল ফারুক।

- মুই মেসত যায়া ভাত খাইম, মোরটাও নে। সিঙ্গারা খাইলে পেট খারাপ করিবে। আবায় কইছে জিলাপি খাইলে কিছু হইবে না।

ফিক করে হাসি দিল ফারুক। টিফিন হাতে বের হইতে না হইতেই সকালের খাটো করে দাঁড়িগোফওয়ালা মাথায় টুপি পরিহিত স্যারটি বেত হাতে দৌড়ানি দেয়াচ্ছে। স্যারকে দেখে যে যার মত পালাচ্ছে। কোনো কিছু বুঁবো উঠার আগেই সপাং করে এক ঘা পিঠে পড়লো ফারুকের। আর কানে ভাসলো,

- খড়কু, এখনো নামাজে যাইস নাই, যা তাড়াতাড়ি যা...

এতোক্ষণে ব্যাপারটা বুঁবো আসল ফারুকের। নামাজের জন্যে বেত হাতে দৌড়ানি খাইতে হয় এইখানে। মসজিদে যেয়ে অযু করে সুন্নাত নামাজ পড়ে নিল ফারুক। মসজিদের ঘড়িতে দেখলো একটা পনেরো। আজ আর বুবি মেসে

খাইতে যাওয়া হবে না। দুইটায় আবার ক্লাস আছে। খুব ক্ষুধা
অনুভব করল ফারুক। শান্তকে সিঙ্গারাটা খাইতে না দিয়ে
নিজে খাইলেও হইত বুবতে পারে ফারুক। শুধু জিলাপি
থেয়ে সারা দুপুর থাকা যাবে না। কালকে থেকে আর কোনো
খাতির-টতির নাই।

হাইয়া আলাস্ব-স্বলাহ্, হাইয়া আলাল ফালাহ্ ॥

কদকা মাতিস্ব-স্বলাহ্, কদকা মাতিস্ব-স্বলাহ্ ॥

মুয়াজিনের ইকামাত শুনতে পায় ফারুক। সবাই নামাযে
দাঁড়িয়ে গেছে। ফরজ শেষ করে দু রাকাত সুন্নাত পড়ে নিল
ফারুক। মসজিদের এক কোণায় আরো দুই রাকাত নামাজে
দাঁড়ালো ফারুক। টেকনিক্যালে পড়ার সৌভাগ্য দেয়ার জন্যে
রবের দরবারে দু রাকাত শুকরিয়ার নামাজ। সিজদায় পড়ে
দু ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো ফারুকের। এরকম একটা
বিদ্যাপীঠে পড়তে পারার অশ্রু।





রাকিবা সুলতানা বর্ষা
একাদশ শ্রেণি

TECHNICAL

Md. Sakibuzzaman Sakib

SSC 2014

Technical is the name of dream
 Technical is the name of passion
 Which gives the efficient treasure to our nation.

Technical is the name of light
 Technical is the name of ideal
 It spreads love which is cordial.
 Technical is the name of strength
 Technical is the name of power
 Which pride and respect never be over.

I proud to be a Technicalian
 Still it's grass remove my pain
 So I wanna go back there again and again.

TECHNICAL

রঞ্জিনী তাসনিম তুষী
 একাদশ শ্রেণি

আমার প্রিয় টেকনিক্যাল, তুমি জ্ঞান সমুদ্রের বিদ্যার অক্ষর ভাস্তর,
 তোমা হতে আমি দীক্ষা পেলাম জগৎ কে জানিবার।

প্রিয় টেকনিক্যালের শিক্ষকগণ,
 আপনারা পথ প্রদর্শক, আদর্শের পতাকা বাহক,
 যম মস্তিষ্কে জ্ঞানদানে কভু কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা নাহি

ওহে টেকনিক্যাল...
 তুমি সুষ্ঠু প্রতিভার বিকাশ ঘটাও
 চিভাকর্ষক মানব মনোবিজ্ঞানের জননী...
 তোমার পূর্ণ আভাস মোর ভবিষ্যতে করবে যশী।

ওগো মোর বিদ্যাপীঠ...
 তুমি সূর্য সম, গোটা ধরণী করো যে আলো।
 তোমার আলো খণে নাশিব মোর ধরার সকল কালো

প্রাণের টেকনিক্যাল...
 তুমি মহাবিদ্যান, জ্ঞান দানে কর মহৎ
 অমর তুমি যুগে যুগে তাই স্মরিবে সতত জগৎ।



মোহাম্মদ নাজমুস সাকিব বাঞ্ছি

এস.এস.সি ২০১৩

এক যে ছিল মিনা

রাজু আর মিঠুকে নিয়ে আলাদীনের জাদুর পাটিতে করে দেশ
বিদেশ ঘুরে বেড়িয়ে মিনা যখন বাংলাদেশে এসে পৌঁছালো
তখন তার মনে হলো তার উচিত দেশের জন্য কিছু করা!

মিনা এবার এইচএসসি দিচ্ছে। সামনেই তাকে নামতে হবে
ভর্তি যুদ্ধে! ছোটবেলায় বাবা বলতেন, “ডাক্তারদের অনেক
সম্মান, তাদের সবাই দেবতা বলে মনে করে, ডাক্তারির
মাধ্যমে মানুষের সরাসরি সেবা করা যায়। বড় হলে তোকে
কিন্তু ডাক্তার হতে হবে মা।” মিনাদের কলেজে মেয়েদের
এপ্রোন পরে যেতে হতো। মা বলতেন, “তোকে নিয়ে
আমাদের কত স্বপ্ন! ওই এপ্রোন যখন একবার গায়ে
জড়িয়েছিস দেখিস তা যেন আর খুলতে না হয়! তোকে
অনেক বড় ডাক্তার হতে হবে। ডাক্তার হলেই খালি টাকা
আর টাকা! মিনা, মা আমার! তোকে কিন্তু ডাক্তার হতেই
হবে।”

বাবা মায়ের দিকে চেয়ে হলেও মিনার মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে
সে ডাক্তার হবে। কিন্তু পড়াশুনা তার একদম ভালো লাগে
না। তাই আজ যখন সে আলাদীনের চেরাগ আর জাদুর পাটি
হাতে পেয়েছে, তখন তার স্বপ্ন গুলো সে পূরণ করবেই!

হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে মিনা জাদুর চেরাগে ঘষা দিল!
নিমেষেই ধোয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে দৈত্য তার সামনে এসে
হাজির হলো!

বিকট এক হাসি দিয়ে বলল,

“আমার কাছে তুমি কি চাও মিনা? তোমার যা ইচ্ছা
আমি পূরণ করবো। কিন্তু মনে রেখ, আমি তোমার শুধু তিনিটি
ইচ্ছাই পূরণ করবো!”

রাজু হা হয়ে সব শুনতে লাগলো! মিঠু বলে উঠলো, “হ্যা
হ্যা... তিনিটি ইচ্ছা... তিনিটি ইচ্ছা!”

দৈত্য বলে উঠলো, “তুমি কি চাও মিনা? সোনা-রূপা, মনি-
মুঙ্গো, নাকি মন্ত্র বড় হাতি? আমাকে বলো!”

মিনা বললো, “আমার এসবের কিছু চাই না!”

দৈত্য বললো, “তবে কি তুমি সিনেমার নায়িকা হতে চাও?”

মিনা হেসে বললো, “ওহহ দৈত্য! আমি আরো ভালা কিছু
চাই! আমি চাই আমি ডাক্তার হবো, ডাক্তার হইয়া এদেশের
মানুষের সেবা করবো!”

দৈত্য একটু আশ্চর্য হয়ে বললো, “অ্যাঁ.. তুমি কি ঠিক বলছো?
কিন্তু.....!”

মিনা বললো, “কোনো কিন্তু নয়। হহহ। আমি ডাক্তার হইয়া
আমার গ্রামের মানুষের সেবা করবো।”

দৈত্য বললো, “তাহলে তো তোমাকে বিসিএস দিয়ে গ্রামে
চাকরি নিতে হবে মিনা।”

মিনা বলল, “হহহ! আমার দ্বিতীয় ইচ্ছা হইলো আমার বিসিএস হইবো। আর তৃতীয় ইচ্ছা এখন বলব না। পরে বলব! আপনি আমাকে তাড়াতাড়ি ডাঙ্গার বানায় দেন আর গ্রামে চাকরির ব্যবস্থা কইଇବ দেন।”

“আচ্ছা ছেউ বন্ধু!” বলে দৈত্য কি এক জাদু করলো মিনা নিজেকে কোনো এক অজো-পাড়াগায়ের হেলথ কমপ্লেক্সে আবিষ্কার করলো! তার গায়ে এপ্রোন জড়নো আর গলায় ঝুলে আছে লিটম্যান স্টেথেক্সোপ। মনে মনে মিনা আজ বেজায় খুশি। সে এখন ডাঙ্গার! সে মানুষের সেবা করবে, মানুষ তাকে দেবতার মতো সম্মান করবে, তার পকেট ভর্তি টাকা থাকবে।

কয়েক দিন ভালোই কাটলো মিনার। যদিও কাজের চাপ অনেক বেশি। তাকেই সব দিক সামলাতে হয়। আশে পাশে সব কামচোর বসে আছে। না বলে দিলে কেউ কিছুটি করে না। ক্লান্ত - শ্রান্ত মিনা যখন রাতে একটু ঘুমোতে যায় তার মনে হয় শরীরে আর কোনো হাড় অবশিষ্ট নেই। সারা শরীর জুড়ে ব্যাথা! নিজেকে বড় একা লাগে মিনার। বাড়ির কথা খুব মনে পড়ে, মনে পড়ে মিঠু আর রাজুর সাথে খুনসুটির কথা। তারপরও সেবা দিয়ে যায় সে। তাকে যে দেবতা হতে হবে!

বিপদ্ধি ঘটলো কয়েকদিন পর। শীতের শেষের দিক। তখনো শীত ভালো ভাবে কাটেনি। ফ্যান দেয়া লাগে না আর কি। মিনা হাসপাতালে রাউন্ড দিচ্ছিলো, একজন রোগীর লোক তাকে ইন্ডিকেট করে বললো, “এই যে সিস্টার! একটু ফ্যানটা ছেড়ে দেন না। এই যে সিস্টার!”

মিনা একটু রেগে গিয়ে বললো, “আমি সিস্টার না। আমি ডাঙ্গার। আর এখন ফ্যান ছাড়ার কি আছে? এখনো তো শীত আছেই। আর দরকার হলে নিজে গিয়ে ছাড়ুন।”

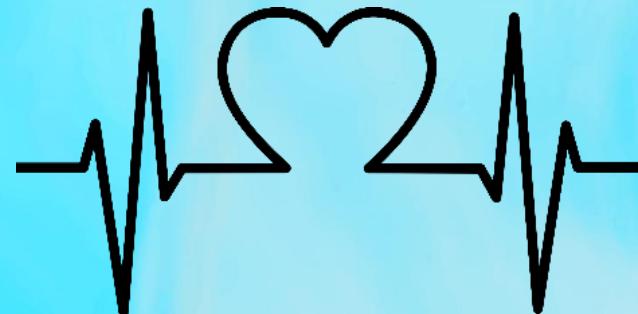
মিনাকে অবাক করে দিয়ে লোকটি বলল, “আপনার মতো গরম মাল রুমে থাকলে, গরম তো লাগবোই! দেন না একটু ছাইড়া।”

মিনা কি বলবে ভেবে পেলো না। লজ্জায় অপমানে সে সেখান থেকে চলে গেল। বিষয়টা তার কলিগকে জানালে বেধে গেল এক তুলকালাম কান্ড। হাসপাতালে সে কি এক মারামারি! একদম রক্তারঙ্গি ব্যাপার-স্যাপার। ডাঙ্গার হিসেবে মিনার

কেন যেন নিজের প্রতি ঘৃণা হতে লাগলো। এভাবেই কেটে গেল কিছুদিন। কিন্তু বিষয়টা মিনা মাথা থেকে কিছুতেই বেড়ে ফেলতো পারলো না।

মিনার নাইট ডিউটি পড়েছে। অনেক দিন হলো সে গ্রামে এসেছে। এবার পোস্টগ্রাজুয়েশনের জন্য কিছু পড়শুনা করা দরকার। তাই প্রায় ৬ মাস পর সে বই খুলে বসেছে। হঠাৎ নার্সের জরুরী তলব, “তাড়াতাড়ি আসেন আপু, মনে হয় হার্ট অ্যাটাকের পেশেন্ট।”

মিনা গিয়ে রোগীর পালস, বিপি পরীক্ষা করলো। কিন্তু জীবনের কোনো চিহ্ন পেলো না। রোগীর লোকদের মিনা বলল, “ওনাকে সি.পি.আর দিতে হবে। মানে বুকে চাপতে হবে। এই শেষ চেষ্টা আমি করতে পারি।” রোগীর লোকেরা বলল, “আপনি যা করেন করেন আপা! আমার আবারে বাঁচান!”



মিনা সর্বোচ্চ চেষ্টা করলো। কিন্তু লোকটিকে বাঁচাতে পারলো না। রোগের কারণসহ সব কিছু মিনা রোগীর লোকদের বুঝিয়ে বলল। কিন্তু রোগীর লোকেরা এবার বেকে বসলো, “না না, যহন আনছি আবা বাইচা ছিল! কিন্তু আপনে বুকে চাইঞ্চা আমার আবারে মাইরা ফালাইছেন! ওই তোরা রুম ভাঙ। এই শালীরে বুঝায় দে আমরা কেড়া!”

রোগীর লোকেরা ডাঙ্গারের রুম ভাঙলো তো ভাঙলোই মিনার শ্লীলতাহানির চেষ্টাও করলো। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিবেশ কিছুটা ঠাণ্ডা হলেও মিনার মনে যে ঝড় চলছিল কেউ মনে হয় তা বুঝতে পারলো না।

হাসপাতাল থেকে মিনা নিজের রুমে চলে গেল। কাঁদতে কাঁদতে সে তার জাদুর চেরাগে ঘষতে লাগলো আর দৈত্যকে ডাকতে লাগলো, “দৈত্য তুমি কই? আমার তৃতীয় ইচ্ছা পূরণ করো! দৈত্য তুমি কই! দৈত্য তুমি কই!” মিনা চেরাগটা ঘষছে

তো ঘষছেই! ঘষছে তো ঘষছেই! কিন্তু দৈত্যের কোনো দেখা
নেই!

হঠাতে মিনা তার পিঠে একটা ঝাটার বারি অনুভব করলো।
“ওই নবাবজাদী! কয়টা বাজে সেদিকে খেয়াল আছে! তোর
না এইচএসসি পরীক্ষা চলে! সেই সাতটায় উঠতে চাইছিলি।
এখন কয়টা বাজে? আর হাত দিয়া বিছানাটার কি অবস্থা
বানাইছিস? এখানে কি মানুষের বাচ্চা ঘুমাইছিল না কুকুরের
বাচ্চা?”

মিনা কাদতে কাঁদতে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, “মা, আমি
ডাক্তার হবো না মা! তুমি আমাকে যা হতে বলো, হবো! কিন্তু
ডাক্তার হইতে বলিও না, মা!”

মিনার কানার তীব্রতা যেন বাঢ়ছে। তা দেখে মা নরম গলায়
বললেন, “কি হইছে মা? কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখছিস? কিন্তু
ডাক্তার তো তোকে হতেই হবে। তোর নানা ভাই তোকে
দেখেই বলছিল যে তুই আমাদের বংশে প্রথম ডাক্তার হবি।
যা দেখছিস দেখছিস, এসব বাজে স্বপ্ন সত্যি হয় নাকি? এখন
ফ্রেশ হয়ে পড়তে বস!”

মিনা কিছু একটা বলতে গিয়েও ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থমকে
গেল। সে মাকে বলেছিল তাকে যেন সাতটার সময় ঘুম থেকে
ডেকে দেয়। আর মা কিনা ভোর ছয়টার সময় এসে ডাক্তার
হবার বয়ান দিয়ে গেল।

মিনা শুনেছে ভোর বেলার স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়!

আচ্ছা মিনার কপালে কি আসলেই দুঃখ আছে?



MINERVA O'BRIAN BRECK

PINK FLOYD SOLO LRB

Warfaze METALLICA

SLAYER ARTCELL VIBE

Slipknot AUTHOHIH

VIKINGS CRYPTIC FATE

এস এম সাকিব হোসেন শীষ

এস.এস.সি ২০১৬



দেবতাখুম দ্রুমণ

ওয়াহেদুজ্জামান কুশল

এস.এস.সি ২০১৫

আমরা (১০ জন) যখন কাঞ্চাই লেকের উপর এমন এক জায়গায় অবস্থিত যেখান থেকে সোজা গেলে বিলাইছড়ি, আর বামে গেলে রাঙ্গামাটি শহর, ঠিক সেই মূহূর্তে আমরা আমাদের পরিকল্পনা পরিবর্তন করি, এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি যে আমরা ২য় দিন যাবো বান্দরবানের দেবতাখুম এ।

পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা ২য় দিন খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়ি। ফ্রেশ হয়েই কাঞ্চাই জেটি ঘাটের সামনে থেকে সিএনজি ঠিক করে রওনা করি লিচুবাগান এর উদ্দেশ্যে। যেখান থেকে আমরা বান্দরবানের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া বাস এ উঠবো। লিচুবাগান পৌঁছাতে সময় লাগলো ৩০-৪০ মিনিটের মতো। সময় তখন ৮ টা। লিচুবাগানে নেমেই আমরা বান্দরবানগামী বাস (লোকাল বাস) ঠিক করার জন্য কাউন্টারে চলে গেলাম। প্রতি এক ঘন্টা পর পর বাস ছাড়ে। এবং সকালের প্রথম বাসটি ছাড়ে ৮.৩০ টার সময়। টিকেট কেটে ফেললাম।

আমাদের হাতে এখনো ৩০ মিনিট সময় এবং আমাদের সকালের নাস্তাটা করা বাকি এখনো। তাই সময় নষ্ট না করে দিনের নাস্তাটা করে ফেললাম। বাস ছাড়লো ৮.৩০ এর দিকে। বাস পাচ কি দশ মিনিট আগাতেই দেখা মিললো এক ছোটোখাটো ফেরী ঘাট এর।

ফেরীতে করে পার হতে হবে কাঞ্চাই হ্রদ এর কিছু অংশ। সামান্য পথ। সময় লাগলো ৫-৭ মিনিট। বাস যখন ফেরীতে, তখন ছেট করে আমার মাথায় আসলো যে, আমরা তো বাসের ছাদেই বসতে পারি, প্রকৃতি টা উপভোগ করতে পারবো আরো ভালো ভাবে। যেই কথা সেই কাজ, দশজনের ছয় জন উঠে পড়লাম বাসের ছাদে। পিচ্চালা সরু পথ, হু হু বাতাস, মাঝেসাজে দু একটা ডাল পাতা এসে গা ছুয়ে যাচ্ছে, রাস্তার মানুষ গুলো আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকছে, বাতাসের হু হু সুরের সাথে মিশে যাচ্ছে আর্টসেলের ধূসর সময়। আহা! জীবন কি তবে এটাই নয়? ৩০-৪০ মিনিটের মধ্যে আমরা বাজারের মতো এক জায়গায় আসলাম। বাসের হেল্পার মামা বললো, আমাদের এবার অন্য বাসে উঠতে হবে। ভাড়া একই থাকবে। শুধু বাস পরিবর্তন আরকি।

পুনরায় আমরা অন্য বাসটির ছাদে উঠে পড়লাম। ঘন্টা দেড়েক এর মধ্যে পৌঁছে গেলাম বান্দরবান শহরে। লিচুবাগান থেকে বান্দরবান শহর পৌঁছাতে মোট সময় লাগলো ২.৫ ঘন্টার মতো। গতব্য আমাদের দেবতাখুম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ঘড়ির কাটা ১১ টার ঘরে তাক করে রয়েছে। তা দেখে সকলের মনেই এক অনিশ্চয়তার জন্ম নিলো। কারণটা ধীরে ধীরেই বুঝতে পারবেন। হাতে সময় কম,

বিধায় আমরা বাস থেকে নেমেই অটো ঠিক করে চলে গেলাম চান্দের গাড়ির ওখানে। এরপর চান্দের গাড়ি ঠিক করলাম, যেই চান্দের গাড়ি আমাদের নিয়ে যাবে কচ্ছপতলী বাজার পর্যন্ত এবং সেখানেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। দেবতাখুম ঘুরে ফিরে আসার পর সেই গাড়িতে করেই আমরা বান্দরবান শহরে ফিরবো।

গাড়ি ঠিক করেই রাতে থাকার জন্য আবাসিক হোটেল ঠিক করে ফেললাম। দশ জনের জন্য কক্ষ নিলাম তিনটি। যতো কম খরচে পারা যায় আরকি!

হোটেল ঠিক করার পর, রুমে ব্যাগ রেখে কোনো রকম ফ্রেশ হয়ে, হাতে একটা গামছা আর পায়ে ট্রাকিং শু পড়েই আমরা চান্দের গাড়িতে উঠে পড়লাম। এবার গন্তব্য কচ্ছপতলী বাজার। যেখান থেকে শুরু হবে আমাদের দেবতাখুমের উদ্দেশ্যে ট্রাকিং। ৫০-৬০ মিনিটের মধ্যে পৌছে গেলাম রোয়াংছড়ি উপজেলায়। বান্দরবান জেলার এই রোয়াংছড়ি উপজেলায় দেবতাখুমের অবস্থান।

রোয়াংছড়িতে আমাদের কাজ হলো গাইড এর সাথে রোয়াংছড়ি থানায় গিয়ে সবার নাম এন্ট্রি করা। সমস্যা হলো, ছুট হাট দেবতাখুম আসার প্লান করার কারণে আমরা আগে থেকে গাইড ঠিক করে রাখার সময় পাইনি। তবে আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে আমরা গাইড পেয়ে যাবো। যেহেতু সময়টা অফ সিজন। কিন্তু সমস্যা হলো, রোয়াংছড়িতে কোনো গাইড থাকেনা। সব গাইডরা থাকে কচ্ছপতলী বাজারে। রোয়াংছড়ি থেকে যার দুরত্ব ১৫-২০ মিনিটের পথ। উপায় না পেয়ে, আমরা আমাদের গাড়ির ড্রাইভার কে বললাম, তার কোনো পরিচিত গাইড থাকলে তাকে কল করতে। কথা মতো আমাদের ড্রাইভার একজন গাইড কে কল করে আসতে বললো। কিছুসময় এর মধ্যেই গাইড চলে আসলো রোয়াংছড়ি থানার সামনে। এসেই সে প্রথম যে কথাটা বললো, “দাদা, সময় তো এখন দুপুর ১ টা। আপনারা যদি ট্রাকিং এ অভ্যন্ত না হোন, তাহলে দেবতাখুম যেতে সময় লাগবে ২ ঘণ্টা। আমরা ৫ টার মধ্যে ব্যাক করতে পারবোনা। তাই আর্মি ক্যাম্প থেকে যাওয়ার পারমিশন দিবে না আমাদের।”

আমরা যখন বান্দরবান শহরে, তখনি ব্যাপারটা আমাদের জানা ছিলো। এরপরো, হাল তো ছেড়ে দেয়া যাবেনা! কিন্তু, গাইড দাদার কথা শোনার পর যেনো আমাদের অনিশ্চয়তা

বাস্তবে রংপ নেয়া শুরু করলো। দেবতাখুমের এতো কাছে এসেও, আমরা ফিরে যাওয়ার মানুষ নই, তাই আমি আর আমাদের এক বন্ধুসহ আমরা গাইড দাদাকে কোনো রকম বোঝাতে সক্ষম হলাম যে, আমরা ৫ টার মধ্যে ফিরতে পারবো। সমস্যা হবেনা কোনো। যাক, একটা দুশ্চিন্তা দূর হলো।

এবার আমরা গাইড দাদার সাথে প্রবেশ করলাম রোয়াংছড়ি থানায়। এরপর ১ কপি করে NID/ Birth Certificate/ Passport/ Varsity ID Card জমা দিয়ে নিজের নাম এন্ট্রি করলাম। এরপর চান্দের গাড়িতে উঠে দ্রুত রওনা করলাম কচ্ছপতলীর উদ্দেশ্যে।



দ্রুত উঠে পড়লাম আর্মি ক্যাম্পে। সেখানে তাদের কোনো রকম বোঝাতে সক্ষম হলাম যে আমরা ৫ টার মধ্যেই ফিরে আসতে পারবো। আর্মি ক্যাম্পের কর্মরত অফিসার আমাদের হৃশিয়ারী দিয়ে দিলেন যে: যদি ৫ টার মধ্যে ফিরে আসতে না পারি তবে গাইড এর লাইসেন্স বাতিল করে দিবেন। যাহোক,

স্বাই ১ কপি করে NID/ Birth Certificate/ Passport/ Varsity ID Card জমা দিয়ে নাম এন্ট্রি করে নিচে নেমে পড়লাম।

এবার পালা ট্রাকিং এর। ও হ্যা, দুপুর ২ টার মতো বেজে গিয়েছে। হাতে সময় খুবই কম। ট্রাকিং করে দেবতাখুম পৌছাতে সময় লেগে যাবে ৪৫ মিনিট (যদি অভ্যন্ত হন)। সময় স্বল্পতার কারণে আমরা কেউই লাঞ্চ করিনি, কিছু শুকনো খাবার হাতে নিয়ে আমরা চলা শুরু করলাম দেবতাখুম এর পথে। দেবতাখুম যাওয়ার দুটো পথ রয়েছে। একটি ঝিরিপথ একটি গিরিপথ। আপনি প্রকৃতিপ্রেমী হয়ে থাকলে অবশ্যই যাওয়ার সময় যে পথ দিয়ে যাবেন, ফেরার সময় অপর পথ দিয়ে ফিরবেন। আমাদের মধ্যে একজন অসুস্থ থাকায় মাঝপথে কিছু সময় ব্যয় হয়েছিলো। ঘন্টাখানেক পর দেখা মিললো একটি পাড়ার। নাম “শীলবান্ধা পাড়া”।

কি অপূর্ব সৌন্দর্য সে পাড়ার। ছোটো ছোটো কুকুর ছানা, গলায় লাল ফিতা জড়নো, কুকুর ছানা গুলো পিছু পিছু হাটলো কিছুক্ষণ, ছোটো ছোটো অসংখ্য ঘর। আমার দেখা পুরো বান্দরবান জেলার সবথেকে বড় “ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীদের পাড়া” বোধয় এটাই। এদিকে একটি বাণ্ণও রয়েছে। নাম “শীলবান্ধা বাণ্ণ”। বর্ষাকালে আসলে অবশ্যই ঝর্ণাটি দেখে যাবেন।

শীলবান্ধা পাড়া থেকে কিছুটা নেমেই গন্ধ পাওয়া গেলো দেবতাখুমের। কি অপরূপ দৃশ্য! এবার পুরো দেবতাখুম ভেলায় করে ঘুরে বেড়ানোর পালা। ভেলা এবং লাইফজ্যাকেট বাবদ প্রতিজন ১৫০/- করে দিতে হলো একটি দোকানে। বর্ষাকাল না হওয়ায়, খুমে পানির পরিমাণ ছিলো কম। তবে, এই খুম টি ৫০-৭০ ফুট গভীর হওয়ার সারাবছর এখানে পানি থাকে। তাই বছরের যেকোনো সময় এখানে আসা যায়।

লাইফজ্যাকেট পরে কিছুক্ষণ হাঁটার পর আমরা বাঁশের তৈরি অসংখ্য ভেলার সমাহার দেখতে পেলাম। প্রতি ভেলায় সর্বোচ্চ দুজন ওঠা যায় এবং ভেলা নিজেদের চালাতে হয়। ভেলা কায়াকিং আরকি!

আমরা ভেলায় উঠে পড়লাম। ভেলায় ওঠাটা একটু কষ্টসাধ্য বটে। ভেলায় প্রথম পা রাখার পর ভেলা অনেকটা পানির নিচে চলে যায় (ভয় পাবেন না, যতোই যা হোক আপনি ভেলা ধরে থাকবেন, ভেলা পানির নিচে গেলেও, ডুববে না, ভেসে আসবে)।

হ্যা, নিজের শরীরের ভারসাম্য টা জরুরি। ভারসাম্য টা রাখলে অন্যাসে ভেলাকে এগিয়ে নিতে পারবেন পানিতে। পানির কল কল ধ্বনি, কিছু সময় অন্তর বৈঠার আওয়াজ, পোকামাকড় আর পাথির কিচিরিমিচির শব্দের মাঝে আপনার মনে হবে, দুপাশের পাহাড় গুলো যেনো আপনাকে কিছু বলছে। ইশারা করছে তার সৌন্দর্যকে আলিঙ্গন করার। দুপাশে পাহাড়ে ঘেরা সরু পথটার মধ্য দিয়ে আপনি যখন ভেলা চালিয়ে যাবেন, ঠিক সেই সময় ভুতুড়ে নীরব পরিবেশটা যেনো আপনাকে মনে করিয়ে দিবে ছোটোবেলার সেই রূপকথার গল্পের কথা। ছোটোবেলায় মায়ের শোনানো রূপকথার গল্পকে বাস্তবে অনুভব করতে কে ই বা না চাইবে!

খুমের স্বর্গরাজ্য দেবতাখুমের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০০ ফুটের মতো। তবে, সময় স্বল্পতা এবং নিরাপত্তা ইস্যুতে আমরা বেশিদূর আগামে পারিনি। দেবতাখুমের সৌন্দর্য আলিঙ্গন করে কচ্ছপতলী বাজার আর্মি ক্যাম্প পৌছাতে আমাদের ৫.৩০ টা বেজে গেলো। কোনো রকমে আর্মি ক্যাম্প অফিসারকে বুঝিয়ে আমরা পুনরায় নাম এন্ট্রি করে চান্দের গাড়িতে করে রওনা করলাম বান্দরবান শহরের উদ্দেশ্যে।



ভুলে

সতীর্থ কুমার দাস
একাদশ শ্রেণি

এতোই তাহার শক্তি, কেউ পায়নি মুক্তি
বাহিরে যাওয়া বন্ধ
সাধারণ মানুষ তাই দিশেহারা অঙ্গ
ধনী দেশ বলে গর্ব যার, এবার তারাও মেনেছে হার
আজ কোথায় তোমাদের সুপারহিরো
কোথায় সেই কবি সুরকার
নেই এখন কেউ আছে শুধু ডাঙ্গার
যাদের বলেছ কসাই
এখন যাচ্ছ কেন তাদের কাছে মশাই?
পুলিশকে বল ঘৃষখোর
তারাই করেছে করোনার বিস্তার দুঃকর
জননেতারা আজ চুপ
কোথায় গেল তাদের ভোট চাওয়ার সেই রূপ!
এসব দেখে পাই না কোন কূল
আসলে বাঙালী তোমাদের ভাবনায়
ভুল সবই ভুল....

কল্প-ডাবনা

সীমান্ত সাহা
একাদশ শ্রেণি

আচ্ছা ধরো,
প্রতিটা মানুষ বইয়ের মতো,
প্রতিটা বই স্মৃতির মতো,
আর তোমার জীবন লাইব্রেরির মতো-
বইয়ের সংখ্যা যত বাড়ে,
লাইব্রেরিতে তার অবস্থান হয় তত ভিতরে,
তার উপর ধুলাবালি পড়তে শুরু করে,
একসময় স্থায়িত্ব হয় লাইব্রেরির বাহিরে।
অথচ আমি জানতে চাই,
‘কতগুলো স্মৃতি নতুন হলে,
জীবন পুরাতন স্মৃতিকে ভুলে যায়’



টেকনিক্যাল,
সৈয়দপুর গভ. টেকনিক্যাল কলেজ!
যেখানে জীবনের ৭ টা বছর কাটিয়েছি।
খাকি প্যান্ট আর সাদা শার্টে চমে বেরিয়েছি,
পুরো কলেজ জুড়ে!
বন্ধুত্বের সংজ্ঞা তো সেখান থেকেই শেখা,
আর পেয়েছি? একটা সুন্দর অতীত
যা এখনো মনে তাড়া দিয়ে ফেরে!

ওবায়দুল্লাহ বিন শাহেদ
এস.এস.সি ২০১৬



মোঃ মুশফিকুর রহমান প্রিভেল
এস.এস.সি ২০১৬

কাঞ্চাই লেক

চট্টগ্রামের ভাটিয়ারী থেকে যখন বড় দিঘীর পাড়ে যাবার উদ্দেশ্যে লোকাল সিএনজিতে উঠেছি, তখনও জানতাম না পাহাড় আর স্বচ্ছ জলাভূমির এক স্নিগ্ধ সৌন্দর্য নিয়ে অপেক্ষা করছে ভাটিয়ারীর রাস্তা। পথে পড়ে সীতাকুন্ড। অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি, পাহাড় আর আঁকাবাঁকা সর্পিল রাস্তা দিয়ে চট্টগ্রাম আমাকে বরণ করে নিয়েছিল। পথে পড়বে বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী। পাহাড়ের ধারে নিজেদের খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিয়েছে ওরা। স্বচ্ছ লেক, কালারফুল বোট কয়েকবার দেখলাম। সাথে পাহাড় তো দেখছিলামই। আঁকাবাকা রাস্তাগুলোও খুব ইন্টারেস্টিং। কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও আবার অতিশয় ঢালু। অনেকটা 'N' লুপের মতো রাস্তা। রাস্তা পদার্থ বইয়ে পড়া ৯০ ডিগ্রী এঙ্গেলের মতো অবস্থা তৈরি করে। এ ধরণের রাস্তা দিয়ে যাওয়া খুবই এডভেঞ্চরাস। যদিও পার্বত্য এলাকাগুলোর দিকে যেতে থাকলে এমন রাস্তাই সবচেয়ে বেশি স্বাভাবিক। পাহাড় কেটে কেটে রাস্তাগুলো বানানো।

বড় দিঘীর পাড়ে এসে সিএনজিয়োগে গত্তব্য হলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। স্কুলের বন্ধু রজিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ওর বাসায় চলে গেলাম। সকাল থেকেই চট্টগ্রাম শহরে বৃষ্টি হচ্ছিল। রজিনের ওখানে যেয়ে ফ্রেশ হয়ে ঠিক করতে থাকলাম যে কোথায় যাওয়া যায়। পাহাড় না সমুদ্র- কোনটায়

যাবো এই সিন্দ্বাতে আসতে পারছিলাম না। বৃষ্টিই কিছুটা সাহায্য করলো। বৃষ্টির দিনে পাহাড়ে উঠা কঠিন- তাই সহজতম সিন্দ্বাত হলো সমুদ্র দেখতে যাওয়া। সাগ্রহে কাঞ্চাই লেক দেখার ইচ্ছা করে রওনা দিলাম দুজন। কাঞ্চাই মোটেও কাছাকাছি কোনো পথ নয়। যেতে গেলে অনেক ঘুরে তারপর যেতে হয়।

রজিন চট্টগ্রাম ভালো জানে। ও যাওয়ার জন্য শর্টকাট রাস্তা নিল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমে সিএনজিতে করে ফতেয়াবাদ এসে তারপর মধুনাঘাট, মধুনাঘাট থেকে আবার সিএনজিতে করে লিচুবাগান। রাস্তা অনেক বড়। কাঞ্চাই মধুনাঘাট থেকে প্রায় ৫০ কিলো। পথে যেতে পড়ল হালদা নদী। এ নদী একমাত্র সেই নদী যার উৎপত্তি ও শেষ বাংলাদেশেই এবং এ নদীতেই একমাত্র প্রাকৃতিকভাবে মাছের পোনা উৎপাদিত হয়। হালদা নদী আমাকে মুঞ্চ করেছিল। রজিন বলছিল আসার সময় হালদা হয়ে যাব। পরে আর তা হয়নি। লিচুবাগানের রাস্তাটা অনেক বড়। এই বিশাল রাস্তাটা পার করে লিচুবাগান থেকে আবার ৩৫ টাকা লোকাল সিএনজি ভাড়ায় কাঞ্চাই যাওয়া লাগে। কাঞ্চাই যেতে যেতে আবার সেই আঁকাবাঁকা সর্পিল রাস্তা, পাহাড়, বনজঙ্গল। সাথে এবার যুক্ত হলো রূপবর্তী কর্ণফুলী নদী। শান্ত দিন, পাহাড়ে মেঘ এসে ভর করেছে। তার নিচে স্বচ্ছ জলের ধারা নিয়ে

আঁকাৰাঁকা পথে অবিৱল বয়ে চলেছে নদী কৰ্ণফুলী। কিছুটা
বৃষ্টি ও মাৰেমাৰে এসে পড়ছে কৰ্ণফুলীতে।

কাঞ্চাই পৌছালাম। কাঞ্চাই বাজারে দেখি অসংখ্য পাহাড় নারী
ঘুৱাফেৱা কৰছে। ওঁদের পোশাক-পৰিচ্ছন্দ সহজিয়া বাঙালী
নারীদেৱ থেকে আলাদা। এসেছে তাৰা বাজারে সদাই
বেঁচতে, সদাই কিনতে। পুৱনৰে চেয়ে নারীৱা বেশ। ওঁৱা
বেশ কৰ্মৰ্থ, শক্ত-সামৰ্থ্য। নিজস্ব নৌকাও আছে ওঁদেৱ। তখন
প্ৰায় দুপুৰ গড়িয়ে বিকেলেৱ দিকে। বাড়ি ফেৱোৱ তাড়া তখন
পাহাড়িদেৱ। লোকমুখে শুনলাম, ওঁৱা ভোৱে গঞ্জে আসে আৱ
বিকাল হতে হতেই চলে যায়। লেকেৱ ঘাটে দাঁড়িয়ে এ কান্দ-
কাৰখনাগুলোই দেখছি। ইতিমধ্যে এক নৌকাওয়ালা চাচা
আমাদেৱ এসে ধৰেছে। আমাদেৱ নিয়ে কাঞ্চাই লেকেৱ
অনেকটা ঘুৱিয়ে দেখাৰে। ২০০ টাকা ভাড়া চাচেছে। আমৱা
ৱাজি হচ্ছি না। ১০০ টাকা, সবশেষ ১৫০ টাকা বললাম। উনি
বললেন এতে উনি যাবেন না, আবাৱ ঘাটে কোনো পৰ্যটক
না থাকায় আমাদেৱ পিছুও ছাড়ছেন না তিনি। শেষমেশ
আমৱাই ৱাজি হলাম। সাঁতার না জানায় আমাৱ নদীতে
নামতে ভয়। রজিন এটা নিয়ে হাসাহাসি কৱলো। মাৰ্খি ও
বাৱবাৱ বলে যাচ্ছেন, “এই নৌকা ডুবে না!”

কাঞ্চাই লেক ঘুৱে বেড়াচ্ছি নৌকায়। পৰিষ্কাৱ নীল জলৱাশি
লেকেৱ। মাৰ্খি চাচা আমাদেৱ সব সুন্দৰভাৱে ঘুৱিয়ে
দেখাচ্ছেন। আশেপাশেৱ সবকিছুৰ বৰ্ণনা দিচ্ছেন। পৰিচয়
হলো, উনি ঠাকুৱগাঁয়েৱ। এখানে আছেন ৪০ বছৰ হলো।

নাম, জয়নাল আবেদীন। জয়নাল চাচা আমাদেৱ পৰিচয় শুনে
উৎসাহিত বোধ কৱলেন এবং কাঞ্চাইয়েৱ বিভিন্ন গন্ধ
আগ্ৰহভৱে কৱতে লাগলেন। বিকেলে আৱ লেকে মানুষ
তেমন নাই। বিশাল জলৱাশিৰ ওপৰ আমৱা ভাসছি। দূৰে
পাহাড় দেখা যাচ্ছে। পাহাড়েৱ নাম ‘সীতার পাহাড়’।
মাৰ্খিচাচা আমাদেৱ একটা পাড়ে নামিয়ে দিলেন ছবি তোলাৰ
জন্য। গিয়ে দেখি সেখানে পাহাড় কেটে বানানো রয়েছে
মসজিদ। চাৰদিকে সবুজ আৱ সবুজ। নিচে কাঞ্চাই লেকেৱ
পানি। ছবি তোলা শেষে ফিরছি আবাৱ লেক ধৰে। দূৰ দিকে
তাকিয়ে আনন্দ হয়ে আমাদেৱ গলায় তখন, “ওৱে নীল
দৱিয়া, আমায় দে রে দে ছাড়িয়া... বন্দী হইয়া মনোয়া পাখি
হায়ৱে কান্দে রইয়া রইয়া”

বৃষ্টি আসছে আৱ যাচ্ছে। আমৱা তাই ভিজছি। লেকেৱ পাড়ে
কাঞ্চাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ। কাঞ্চাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ মাটিৰ নিচে
সাত তলা পৰ্যন্ত। পানিকে টাৰ্বাইনে ঘুৱায় বিদ্যুৎ উৎপন্ন
কৱে।

কাঞ্চাই বাজারে হালকা নাশতা সেৱে এবাৱ বাড়ি ফেৱা।
ফিরতি পথে শীত বেড়েছে। পাহাড় মেঘ ঘন হয়ে পড়েছে,
তবে কৰ্ণফুলী তখনও প্ৰশান্ত। বাড়ি ফিরতে অবশ্য অনেক
দেৱী হয়েছে। সাৱাদিনেৱ ক্লান্তি তখন আমাৱ শৱীৱে কিন্তু
দিনশেষে প্ৰশান্তময় দৃশ্যগুলোৱ কথা মনে কৱে আমাৱ মন
তখন প্ৰশান্ত।



ফুটবলে টেকনিক্যাল এর মেরা অর্জন



মোঃ রেজওয়ান মিরাজ

এস.এস.সি ২০১৬

সালটা ২০১৫। আমরা তখন ক্লাস টেনে, সপ্তবত সেপ্টেম্বর মাস। কবির স্যার ক্লাসে এসে বললেন আন্তঃস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। আমাদের স্কুলকে তিনি ফুটবল এ এন্ট্রি করাবেন। আমাদের মধ্যে তাই একটা কৌতুহল এর সৃষ্টি হলো যেহেতু প্রতিবারই আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় স্কুলের যে টিম হয় তাতে ক্লাস টেনের প্লেয়ারদের আধিক্য থাকে। যদিও গতবারের প্রতিযোগিতায় আমাদের দুই বন্ধু মেহেদী এবং দুরন্ত জায়গা করে নিয়েছিল টিমে।

সবার মাঝে একটা ভাবনা আসলো কিভাবে টিম গঠন করা যায়। কারণ এবার শুধু অংশগ্রহণই নয় সবার মাঝে জেতার আকাংখা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল! তো সবাই মিলে একটা গড়পড়তা প্রাকটিস ম্যাচ খেলার পরিকল্পনা হলো এবং সেখানে যারা ভালো খেলবে তারাই টিমে থাকবে। সেই ম্যাচের পর স্কুলের মাঠে অবস্থিত মুক্তমঞ্চে বসে আমরা টিম সিলেক্ট করেছিলাম। আমার এখনো মনে আছে সেই টিম সিলেক্ট করেছিল তারাই যারা প্রাকটিস ম্যাচটি খেলেনি। সবার মাঝে জেতার একটা আগ্রহ তখনই দেখা যাচ্ছিল। সিলেক্টর হিসেবে ছিল আমার যতটুকু মনে পরে ওবায়দুল্লাহ বিন শাহেদ ফুয়াদ, পুরো নামটাই তার লিখলাম কারণ আমাদের আরো একজন ফুয়াদ আছে! এছাড়াও ছিল প্রিভেল, পিয়াল। আমি এবং আদনান পাশে বসে কিছু মতামত দিয়েছিলাম।

সেদিন যে টিম গঠন করা হয়েছিল সেটাই আমাদের ক্ষেত্রাদ ছিল। তা হলো- এশ্বর্য, আকাশ, মিরাজ, আদনান, মুঘা, নুরুল

হুদা, সম্পদ, স্বাধীন, রিয়াদ, ইমারত, আফিদি, মেহেদী, সাকিব, শফিকুল, দুরন্ত।

প্রথম ম্যাচ ছিল আমাদের লায়স স্কুল এন্ড কলেজ এর সাথে। আগে থেকেই একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা কাজ করছিল দুই দলের মধ্যে। আমার নিজের মধ্যেও একটা অন্যরকম জেতার তাড়না অনুভব করছিলাম কারণ বিপক্ষ দলে ছিল আমার ক্লোজ বন্ধু আসিফ। তো খেলা শুরু হওয়ার পরপরই মাঠের আসল লড়াই চোখে পড়েছিল। ছোট ভাই সাকিবের ফ্রি-কিক থেকে গোলে প্রথম দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা লিড নিয়েছিলাম। তারপর আরো পরপর দুইটি গোলসহ মোট তিনটি গোল হজম করতে হয়েছিলো লায়স স্কুল এন্ড কলেজকে আমাদের প্রাণপ্রিয় টেকনিক্যালের কাছ থেকে।

আমাদের আদনান, মুঘা (ছোট ভাই) এবং আমি মিলে গড়া ত্রয়ী ডিফেন্সের কাছে বল ভেড়াতেই পারেনি বিপক্ষ দল যা ফাইনালের আগ পর্যন্ত কোনো গোল হজম না করার মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়! যদিও ম্যাচের সময় স্বল্পতার কারণে বেশীরভাগ ম্যাচই টাইব্রেকারে নিষ্পত্তি হয়ে আমরা জিতেছিলাম। আমরা যেসব টিমের সাথে জিতে ফাইনালে



গিয়েছিলাম তা হলো- লায়স স্কুল এন্ড কলেজ, কয়া গোলহাট হাইক্ষুল, ইসলামিয়া স্কুল এবং পোড়াহাট মাদ্রাসা।

ফাইনাল খেলাটি হয়েছিল আল ফারুক স্কুল এর সাথে। ফাইনালে যাওয়ার পথে পুরো টিমের সকলের নিঃস্বার্থ অবদান ছিল তবে বিশেষ করে যাদের কথা না বললেই নয়- মুম্বা, সাকিব এর নজরকাড়া পারফরম্যান্স এর সাথে স্বাধীন, ইমারত এর মাঝমাঠের শৈল্পিক ফুটবল এবং ফিনিশিংয়ে মেহেদী এবং সম্পদ সাথে শফিকুল। পুরাই একটা প্যাকেজ ছিল ফুটবল টিমের। পুরো টুর্নামেন্টেই সব টিম থেকে যা আলাদা করে রেখেছিল তা হলো ঐশ্বর্য এর গোলকিপিং এবং আমাদের দর্শকদের সাপোর্ট। প্রায় প্রতিটি খেলায় স্কুলের ক্লাস বন্ধ করে সবাই খেলা দেখতে গিয়েছিল সৈয়দপুরের কুন্দলে অবস্থিত স্টেডিয়াম মাঠে। দ্বিতীয় ম্যাচে কয়া গোলহাট হাই স্কুলের সাথে জেতার পর পুরো ট্রাকে করে সৈয়দপুর শহর প্রদক্ষিণ তারই প্রতিফলন! যদিও আমরা ফাইনাল জিততে পারিনি, বৃষ্টিবিঘ্নিত ফাইনালে আল ফারুক স্কুলের কাছে ২-০ গোলে হেরেছি। তবুও টেকনিক্যাল এর ফুটবল ইতিহাসের সর্বোচ্চ অর্জন এনে দেয়াটাই বা কম কিসের। স্মৃতির অংশ পাতায় লেখা রয়ে যাবে এই ফুটবল টিমটি।





আবার যেতে চাই চিরচেনা প্রাণের সেই অঙ্গনে,

প্রিয় সখা-মুখগুলি দেখার জন্যে!

ক্লাসরুমটা ঠিকঠাক আছে তো নিঃসঙ্গতায়?

ফায়াত মুঝ

নবম শ্রেণি

কল্পনালগ্ন

আশরাফুল বিন শফী রাবি

এস.এস.সি ২০১৫

আমি ছিলাম অপেক্ষারত -

চন্দ্রাবীথিতে কারো আগমন ঘটবে বলে।

তার কি আসার কথা ছিলো?

আজানু চুম্বিত কালো চুল,

নিকণ সৃষ্টিকারী চপল চরণযুগল,

বিন্দুতে সিদ্ধুর শিহরণ জাগানিয়া নাকফুল,

খাঁদহীন পূর্ণতা দিয়েছিলো নির্লিঙ্গ আয়তনেত্র।

রাতের শহর থেকে কাঞ্চনজঙ্গল দিয়েছিলেম দৃষ্টি;

স্মিতশ্রোতী খরখরিয়ায় মিশেছিলো আমার স্বপ্ন।

অধর স্পর্শ অধরাই রয়ে গেল,

সে শত কোটি আলোকবর্ষ দূরে।

এখান থেকেই শুরু আলেয়ার

হয়তো কিছু স্বপ্নের বাস্তব অস্পৃশ্য।

কল্পনালতা আমার, আমি কল্পনালতার!

কবিতা

রিতু সরকার
এস.এস.সি ২০১৪

কখনো মনে হয় নিজেকে
হারিয়েছি আজ কোন কারণে,
কখনো মনে হয় অন্ধকারে
ডুবে গেছি চিরতরে,
হ্যাঁ, আমি পথ হারিয়েছিলাম
আবার ফিরে পেয়েছি সে পথ,
তবু তা জেনেও সে পথে হেঁটেও
মনে হচ্ছে যেন এ পথে
গিয়েও কি পাবো আমার স্বপ্নকে
কখনো সত্য মনে হয়,
নিজেকে বড় অসহায়
কেউ নেই কেউ নেই,
আমি আছি একা আমার সাথে
মনের মাঝে যে ছোট আশার আলো,
এখনো আমার বলছে
এগিয়ে যাও এগিয়ে যাও এখনো সময় আছে
তুমিই জিতবে,
তুমিই বিজয়ী হবে।

ঘোর ও নির্বোধ লোহা

ওবায়দুল্লাহ বিন শাহেদ

এস.এস.সি ২০১৬

১. ঘোর

ঘড়িতে ঠিক ছয়টা বেজে এগারো মিনিট।

কৃত্রিম আলোতে অন্ধকার যেন আরো গভীরভাবে ফুটে উঠেছে,

ক্যানভাসের রংয়ের মতো চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে নদীর জলে।

এ যেন অন্ধকারের একচ্ছত্র আধিপত্য।

অথচ মানুষগুলোর কোনো ভয় নেই,

নাকি ভীত হয়েও প্রকাশ করছে না!

এসময় মানুষগুলোর মনের অবস্থা জানতে পারলে মন্দ হতো না!

অথচ একমাত্র আল্লাহই অস্তর্যামী।

২. নির্বোধ লোহা

সময়ের সাথে মরিচাকেও আপন করে নিয়েছে লোহার টুকরোগুলো,

এখন শক্রতার বদলে স্খ্যতাই বেশি।

সিমেন্ট-বালির আস্তরণগুলো অনেক আগেই চলে গিয়েছে,

চরম একাকীত্বে সামান্য বাতাসের পরশই দিয়েছে অপার আনন্দ।

করণা-ছলে শীতল জলও এসে জুড়ে বসেছে,

নির্বোধ লোহাগুলো এতেই পরিত্থির ঢেকুর তুলে,

ভবিষ্যতের চিন্তা ছেড়ে বর্তমান নিয়েই বেজায় খুশি।

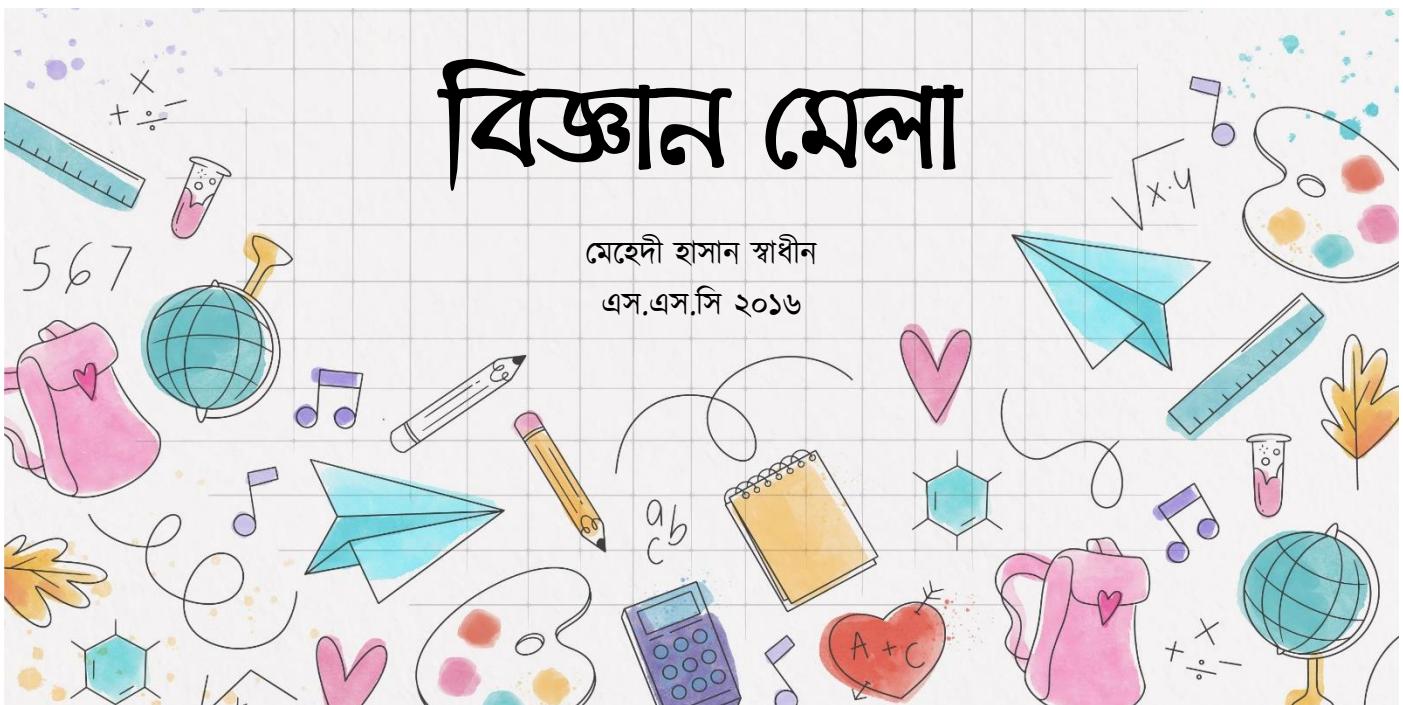
ইস! আজ নির্বোধ লোহাগুলোর যদি সামান্য রসায়ন-জ্ঞান থাকতো!



শিল্পা মজুমদার
এস.এস.সি ২০১৬

বিজ্ঞান মেলা

মেহেদী হাসান স্বাধীন
এস.এস.সি ২০১৬



টেকনিক্যাল একটা ভালোবাসার নাম। ভালোবাসার মানুষদের চিরন্তন শাস্তির স্থান, জীবনের অন্যতম সুন্দর দিনগুলো কাটানোর স্থান। টেকনিক্যালের সাথে আমার যাত্রা শুরু নবম শ্রেণিতে। কলেজ পর্যন্ত যে কটা বছর কাটিয়েছি মনে হয়েছে যেন খুবই অল্প সময়। জানি সকল টেকনিক্যালিয়ানের কাছেই এমনটা মনে হয়। কারণ ভালোবাসার জ্যাগায় সময় খুবই দ্রুত যায়। তবে এই অল্প সময়ের মধ্যেও কিছু এমন স্মৃতি থাকে যা কখনোই ভোলা যায় না। টেকনিক্যাল লাইফের তেমনি একটি স্মৃতি টেকনিক্যালের প্রথম বিজ্ঞান মেলা। আর সবচাইতে বড় বিষয় আমরাই ছিলাম সেই ব্যাচ যারা টেকনিক্যালে বিজ্ঞান মেলা আয়োজন করেছিল।

সাল ২০১৫। আমরা কিছু ছাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা এর জেলা পর্যায়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। সেবার আমাদের কাছে এত বেশি প্রজেক্ট আসে সকল ক্লাসের ছাত্রদের কাছ থেকে যে আমরা কোনটা ছেড়ে কোনটা নিব এই নিয়ে ভালো রকম একটা সমস্যায় পড়ি। কারন সব গুলোই ভালো ছিল।

ঠিক তখন আমাদের মাথায় চিন্তা আসে কেননা আমরা আমাদের কলেজেই একটা বিজ্ঞান মেলা করি, সেখানে যে জরী হবে সেই যাবে জেলা পর্যায়ে। তো ২/৩ জন গেলাম হাফিজ স্যারের কাছে। স্যারকে জানালাম আমাদের চিন্তা এবং স্যারের যে রিঅ্যাঙ্ক ছিল তা সত্যিই, অন্তত আমি আশা করি

নি! স্যার বললেন, “তোমাদেরই আমি খুঁজছি। ছাত্ররা যদি আগ্রহ না দেখায় তাহলে কিভাবে হবে এসব। আমি তোমাদেরকে সকল প্রকার সাহায্য করব।” স্যারের সেই উৎফুল্ল চেহারা আজও আমার মনে পড়ে।

হাফিজ স্যারের সাহায্যে আমরা বিজ্ঞান মেলা আয়োজন করি। তবে খুব একটা সহজে হয়নি কাজটা। যে কলেজে গত ৪৭-৪৮ বছরে বিজ্ঞান মেলা হয়নি সেখানে নতুন করে চালু করা সহজ নয়। প্রায় ১ মাসের মত চেষ্টা করার পর অবশেষে আমরা অনুমতি পাই। কলেজ থেকে একটি বাজেট দেয়া হয়, তবু সত্তি বলতে এত কম বাজেট আশা ছিল না। কারণ সৈয়দপুরের একমাত্র সম্পূর্ণ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, যার ছাত্ররা গর্বের সাথে প্রতি বছর জেলা পর্যায়ের বিভাগীয় পর্যায়ে



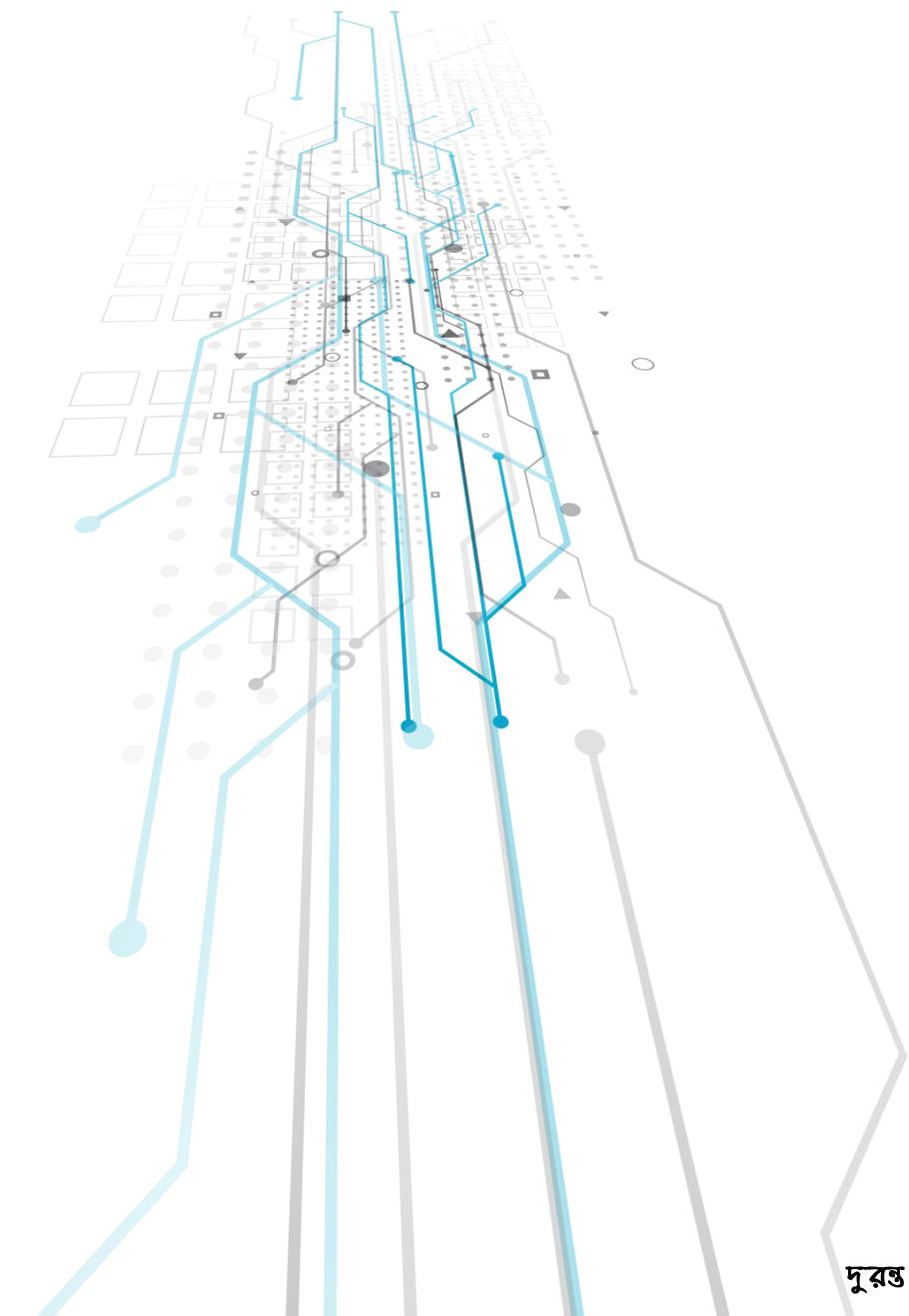
বিজ্ঞান মেলায় সেরার পুরস্কার নিয়ে আসছে তাদের নিজের প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান মেলা হবে একটা আশা তো থাকেই।

তবে বাজেট যেমনই হোক টেকনিক্যালিয়ানদের উৎসাহ কম ছিল না। প্রায় ১ সপ্তাহ নিয়ে প্রস্তুতি চলে। সবাই নিজ নিজ প্রজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত। একটা উসব মুখর পরিবেশে সবাই কাজ করছে। টেকনিক্যালের সবই তো উৎসব।

মেলার দিন ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত প্রতি ক্লাসের একাধিক দল ছিল। যেখানে প্রায় ৩৫ টিরও অধিক প্রজেক্ট আসে। দিনটি ছিল সত্যি একটি আনন্দের দিন। এরপর একবছর পর আবারও একবার বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয়, সেবারও নেতৃত্বে ছিলাম আমরা। প্রতিবারই হাফিজ স্যার, আউয়াল স্যার, হাবিব স্যার, মিলন স্যারের সাহায্য আর উৎসাহ ছিল আমাদের প্রধান চালিকাশক্তি। স্যারদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ।

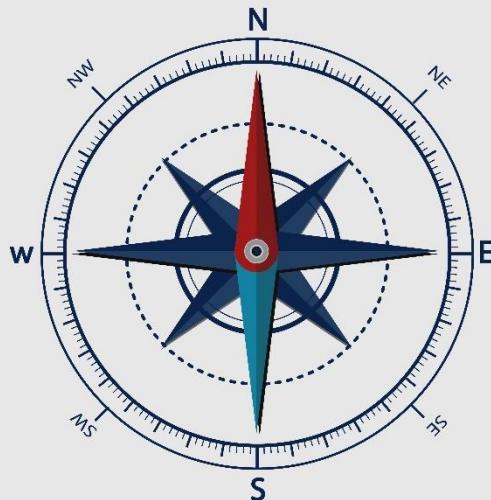
তবে দুঃখের বিষয় এখন আর বিজ্ঞান মেলা হয় না টেকনিক্যাল কম্পাসে। টেকনিকালে কোনো বিজ্ঞান ক্লাব ও নেই। আমরা, আমাদের সিনিয়র ভাইরা অনেক চেষ্টা করেছেন। একবার একটি ক্লাব প্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু সেটাও এখন নেই। শুধু সৈয়দপুর নয় গোটা উত্তর বঙ্গের সেরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে নেই কোনো বিজ্ঞান ক্লাব, হয় না কোনো বিজ্ঞান মেলা। এটা সত্যিই কষ্টের বিষয়।

বর্তমান যারা টেকনিক্যালে আছ, তোমাদের কাছু অনুরোধ টেকনিক্যালে বিজ্ঞান মেলা আবার চালু কর। ক্লাব বানাও। তোমরা চেষ্টা কর। সাহায্যের জন্য স্যাররা আছেন। তোমাদের সিনিয়ররা আছেন। শুধু তোমাদের উৎসাহ লাগবে আর লাগবে ভালো কিছু করার ইচ্ছা।



যাত্রী

শাদমান শাহরিয়ার সিফাত
এস.এস.সি ২০১৭



ব্যস্ত শহরের ঘনবসতির মাঝে একটি স্টেশন অবস্থিত। স্টেশনটি নির্দিষ্ট পরিসীমায় সীমাবদ্ধ, দূর থেকে দেখার উপায় নেই। নিরিবিলি নিশুল্প পরিবেশ। তবে হরেক রকমের গাছ, পাখ-পাখালি, বিলাসী ঘাস, মসজিদের আজান এর নিসঙ্গতাকে দূর করে দেয়। প্রথম দেখায় খুব সাধারণ মনে হয়। বয়সের ভারে অবকাঠামো পুরনো হয়ে গেলেও জনমহলে প্রচলিত এর বৈশিষ্ট্যগুলো অরূপের মত উজ্জ্বল। এক একটি ট্রেন আসে, কিছুক্ষন দাঁড়ায়, আবার নির্দিষ্ট গন্তব্যে পাড়ি দেয়। সহস্র যাত্রী এই স্টেশনের ট্রেনের ঢিকিটের অপেক্ষায় থাকে। তবে সাধারণ স্টেশনের মতো এর ঢিকিট খুব সহজেই পাওয়া যায় না। রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয়।

কালোবাজারির কোনো সুযোগ নেই। কয়েকটি লোকাল ট্রেন আছে, তবে ১২ টার বিশেষ ট্রেন স্টেশনটিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

যাত্রীরা এসে প্লাটফর্মে দাঁড়ায়। নির্দিষ্ট ট্রেনের যাত্রীরা ব্যাচ আকারে নিজেদের যাত্রার প্রস্তুতি নেয়। এই সময় স্টেশনের দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের সাথে তাদের পরিচয় ঘটে। তাঁরা যাত্রার নিয়মাবলী শিখিয়ে দেয়। এর বাইরে, ট্রেনের জানালা দিয়ে বিস্তৃত সবুজ মাঠ দেখার কৌশল ও শিখিয়ে দেয়। অনেক যাত্রীর কাছে জানালাটাই মুখ্য হয়ে উঠে। কিছুক্ষণের পরিচয়ে যাত্রীরা কর্মকর্তাদের আজীবনের সঙ্গী বানিয়ে নেয়।

স্টেশনের প্রবেশ করলেই বাম দিকে একটি বট গাছ চোখে পড়ে। তার পাশেই যাত্রীদের জন্য একটি লাইব্রেরি। পশ্চিমে একটি মসজিদ, যেখানে যাত্রী ও দ্বায়িত্বরত কর্মকর্তারা একসাথে নামাজ আদায় করে, অপূর্ব দৃশ্য। মসজিদের পাশেই

আর একটি বট গাছ, যার বিশালতায় যাত্রীরা নিজেদের নতুন করে আবিষ্কার করে। বট গাছের কোল ঘেঁষে শানে বাধা একটি পথ উত্তরে চলে গেছে। এক দু পা করে পথটি ধরে এগোলে স্টেশনটির বিশাল সবুজ মাঠটির সাঙ্কাণ পাওয়া যায়। মাঠের এককোণে একটি উন্মুক্ত মঞ্চ রয়েছে, যেটি অতীত থেকেই যাত্রীদের অনুপ্রাণিত করে আসছে। ঐ পথে হাটতে হাটতে উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত স্টেশনের যাত্রীদের আবাসিক ভবনে পৌঁছা যায়। আগেই বলেছি, এটি কোনো সাধারণ স্টেশন নয়। দূর দূরান্তের যাত্রীরা ট্রেন ধরার জন্য এই আবাসিক ভবনে আশ্রয় নেয়। তবে “আবাসিক” নয়, যাত্রীদের কাছে “স্বর্গ” নামেই পরিচিত এই ভবনটি।

সূর্য মাথার উপরে আসে, যাত্রীদের ক্ষিদে পায়। স্টেশন থেকে যাত্রীদের পুরি-সিংগাড়া দেওয়া হয়। অতি নগণ্য বাসি খাবার। তবে এই বাসি খাবারটিরো বিশেষত্ব আছে। সবুজ মাঠে দল বেধে খেতে বসলেই তা অনুধাবন করা যায়। খাবারের উৎছিট অংশ ফেলে দিলে গাছের দোয়েল এসে খাওয়ার চেষ্টা করে। এই দোয়েলটির পিছু নিলেই, সে আর একবার পুরো স্টেশনটির সাথে পরিচয় করে দেয়। তখন আবারো স্টেশনটিকে নতুন লাগে। তবে এই নতুনতা বাইরের নিষ্ঠুরতা থেকে মনকে পরিব্রান্ত করে দেয়।

হঠ্যাং ছইসেল বেজে উঠে। যাত্রীরা দৌড় দিয়ে প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ায়। মালামাল গোছানো নিয়ে তুমুল ব্যস্ততা শুরু হয়। ট্রেনে উঠার সময় আসে। তবে উঠার আগে তারা হ্যাচকা টান অনুভব করে। নিজেদের মধ্যে প্রশ্ন জাগে, ‘আরে!! মূল্যবান জিনিসটি ফেলে যাচ্ছ তো।’ মন চায় পেছনে ফিরে যেতে।

কিন্তু ওই দিকে আবারো ভুইসেল বাজে, ট্রেনের চাকায় গতি আসে। ফেলে আসা জিনিসটা আর নেওয়া হয় না। দৌড় দিয়ে দরজার হাতল ধরে ট্রেনে উঠতে হয়। নির্দিষ্ট আসনে বসতে হয়, কিন্তু নিজেকে শান্ত রাখা যায় না। তখন সেই “জানালার” কথা মনে পড়ে যায়। জানালার দিকে ঝুকে বারবার স্টেশনটিকে দেখতে হয়। ট্রেনের গতি বাড়ে আর স্টেশনটি দৃষ্টিতে ছোট হয়ে আসে। যাত্রীদের হাত-পা শক্ত

হয়ে আসে। চিংকার করে বলতে চায়, “ভাই একটু থামান!! আমি যে আসল জিনিসটা ফেলে এসেছি। দৌড় দিয়ে নিয়ে আসি।” তখন ট্রেন আরও দ্রুত গতিতে ছুটতে থাকে।

অবশেষে, ট্রেনের ঝাঁকুনিতে বুজে আসা চোখ ফিরে যাওয়ার স্মৃতি বুনতে থাকে। এইবার গন্তব্যের নয়, ভালোবাসার যাত্রী হয়ে তারা ফেরার অপেক্ষায় থাকে।



ছবি: কাব্য যায়



সামছুমাহার সুইটি

এস.এস.সি ২০২০

জননী তুল্য টেকনিকগাল

আব্দুস সবুর সৌরভ

একাদশ শ্রেণি

মা তোমারি চরণে হয় যেন আমার মরণ
 আশ্বাস রাখি আমারে তুমি করিবে স্মরণ।
 এসেছিলাম গুটি পায়ে তোমার সবুজ শাখে
 আমায় বরণ করিলে তোমার কোমল কাখে।

মা তোমার দর্শন অপরূপ
 যতই দূরে থাকি গো মা
 অন্তরে আঁকিব না তার নবরূপ।

মা সবই তোমার তরে শেখা
 তোমার চরণে নত হইয়া
 আমার স্বপ্ন পাইবে তার বাস্তব রেখা।

মাগো তুমি আমার পথের প্রেরণা
 নিঃশ্বাস থাকিতে করিব না অবমাননা।

মাগো তুমি পুলকিত মনের কোণে
 সদ্য ফোঁটা তাজা পদ্মের স্বাণ
 তোমার তরুর শিশিরে লুকিয়ে আমার বিন্দু প্রাণ।

রণক্ষেত্র

বুসরানা আলমী
একাদশ শ্রেণি

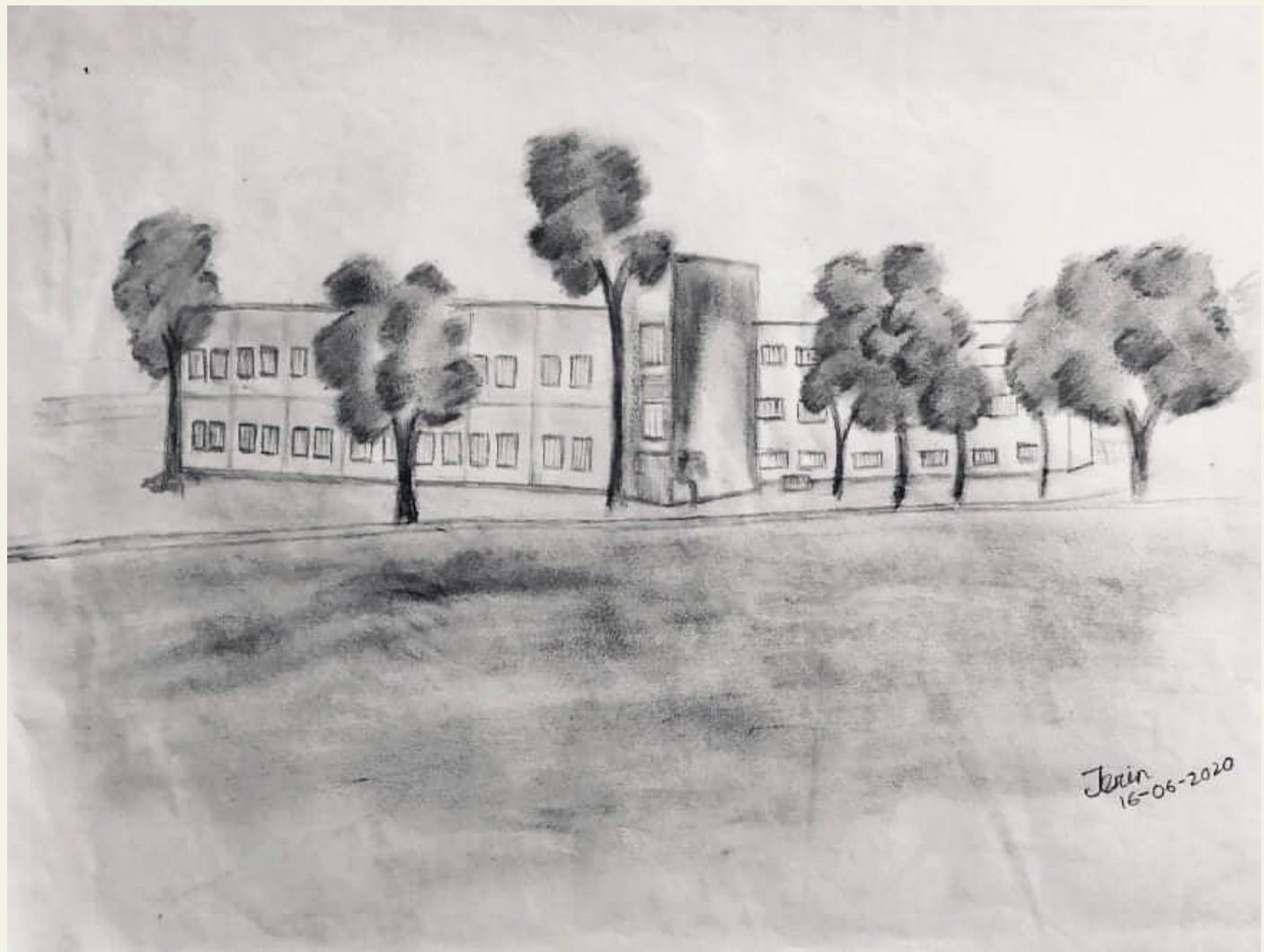
অপরাহ্নের ক্লান্তি লগনে, একরাশ খোলা চুলে,
বাতায়ন ফুঁড়ে, বহুদূর পানে দৃষ্টি গিয়েছে চলে।
আঘার স্বাদ, ঘোর অবসাদ, কি যে খুঁজে ফেরে মন,
দূর থেকে যেন চিৎকার করে ডাকিতেছে কাশবন।

ঘরের কোণের আবদ্ধতায় দীর্ঘশ্বাস ভরা,
এখানে আটকে শরীর আমার, হৃদয়টা ঘরছাড়।
বদ্ধতা নয় পুরো ঘরময়, বন্দি আমার হিয়া,
প্রকৃতির টান হৃদ আহ্বান, হাওয়ায় মিশেছে গিয়া।

দায়িত্ববোধ, শত ব্যঙ্গতা ঘিরে রাখে সারাদিন,
কল্পনা স্নোতে পারি না ভাসতে, সময় বেশ কঠিন।
যুদ্ধ তো শুধু বাহ্যিকে নয়, মন আমার রণক্ষেত্র,
তবুও ভাঙ্গি না, শক্ত যে আমি, শুক্ষ আমার নেত্র।

এ ঝাড়ের শেষ করে নিঃশেষ আমায় দেবে মুক্তি,
তার আগে আমায় দমিয়েই যাবে, প্রচলিত যত যুক্তি।

স্বাধীন দেশে, আমরা স্বাধীন, যুদ্ধ হয়নি শেষ,
শত দোটানায় মনের ভেতরে, চলবে যুদ্ধ বেশ।



জেরিন জিসা
একাদশ শ্রেণি

SGTC

মুশফিকা তাসনীম
একাদশ শ্রেণি

অনেক ইচ্ছা ছিল যে রংপুর ক্যান্ট এ পড়ব। কিন্তু আমার দুইজন শ্রদ্ধেয় ভাইবোন টেকনিক্যাল থেকে বুয়েট এবং মেডিকেল এ চাঙ পায়। আর একজন ভাইয়া রংপুর ক্যান্ট থেকে পড়ে ভালো কোথাও চাঙ পায়নি। তাছাড়া আমার বাসা থেকে সৈয়দপুরে যোগাযোগ ভালো। দিনে দুইবার করে যাওয়া আসা করা যায়। আর সবাই এই টেকনিক্যাল কলেজের অনেক প্রশংসন্ত করে। সৈয়দপুরের স্থানীয় মানুষদের কাছে এই কলেজটি উন্নতবঙ্গের অক্ষফোর্ড নামে পরিচিত। সুনামধন্য এই কলেজটিতে পড়ার সুযোগ হয়।

পহেলা জুলাই, কলেজের প্রথমদিন। অরিয়েটেশন ক্লাস। কামরুন্নেছা ম্যাম কে দেখে আমি তো মুঞ্ছ হয়ে গেলাম। কি অসাধারণ তার উপস্থাপনা! ম্যাম কে এত ভালো লাগে যে ম্যামের ক্লাস করার জন্যই সবসময় কলেজে যেতাম।

বাবার ক্লাসে সবচেয়ে বেশি মজা হয়। “আজকে তোমরা মনে হয় কম বুবাতেছো” মিস করি সত্যি।

জাকির স্যারের ক্লাসে “ঘারা হাত তালি দেয় তারা কার ভাই?” এই বাণী টি শোনার সুযোগ হয়েছিল।

থেটা, জেরো, এই থামো, আমরা করাইছি, আমরা পড়াবো, এই কথাগুলো কি আর কথনো শুনতে পাব?

দেলোয়ার স্যারকে খুব কিউট লাগে। স্যারের বোঝানোর স্টাইলটা অসাধারণ।

সোহেল আরমান স্যার আর এরশাদ স্যারের ক্লাসে আমি সবসময় ভয়ে থাকি। কখন যে কি ভুল করে বসি।

আতাউর স্যার এর উপর আমার অনেক বান্ধবীকে ত্রাশ খেতে দেখেছি। কিন্তু স্যার সত্যি জোস।

নুসরাত ম্যাম এত ফাস্ট কথা বলতে পারে! ম্যাম সত্যি অনেক ভালো সেটা আমি পিকনিকের দিন বুবাতে পেরেছি। ম্যাম পড়া ধরতে শুরু করলে খুব টেনশনে থাকি। আমায় যেন পড়া না ধরে।

প্রিমিপাল স্যার মাঝেমধ্যে এসে বোরিং ক্লাস খুব মজার বানিয়ে দেন।

বাকী বিল্লাহ স্যার এর যেদিনই ক্লাস করেছি উনি ফ্লো চাট পড়িয়েছেন।

পীতাম্বর এর কাল গুলো মনে হলে এখনো খুব হাসি পায়। আজকে না হয় থাক, ক্লাসে কেউ বায়োলজি না পারলে স্যার ও বুয়েটে পড়বে, ম্যাথ না পারলে স্যার ও মেডিকেল এ পড়বে আর একটুতেই হাততালি দেওয়া ছিল সব স্টুডেন্ট এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

কলেজের টিফিন জিলাপি আর সিঙ্গাড়া। উফফ! আমি প্রতিদিন টিফিন নিলেও খাই না, ফেন্ডের দেই।

রিইউনিয়ন এ অনেক মজা করেছি। পহেলা বৈশাখে ও নাকি অনেক বড় অনুষ্ঠান হয় এই কলেজে। কিন্তু সৌভাগ্য হলো না আর দেখার।

প্রিয় টেকনিক্যাল তুমি সত্যিই অনেক কিছু শিখিয়েছো। অনেক ভালো বন্ধুও পেয়েছি। একজন টেকনিক্যালিয়ান হিসেবে সত্যি প্রাউড ফিল হয়।

ধূঢ ধূমন

মোঃ ওজায়ের আসিম

নবম শ্রেণি

বিমুক্ত শ্রোতা আজ এক ক্ষণ পেয়েছে, তোমার জন্য কবিতার কিছু
চরণ লিখা হয়েছে।

প্রিয় মহাবিদ্যালয়

টেলক সকালটা আমার আজও মনে পড়ে,

হৃদয়ের গভীরে প্রশান্তি বয়ে যায়

প্রথম আগমন আমার যে দিনটায়।

সেই সকালে ওঠা বুকের কাঁপুনি এখনো থামে নাই;

শুধু থেমে গেছে অদৃশ্য উদাসীনতা।

আমার যদি টেলিপ্যাথি বোধগম্য হতো

তবে সে অনুভূতি সবারই বুক

কাঁপিয়ে তুলতো।

বিসর্জা তুমি

বিমোহিতা তুমি

তুমি মহাবিদ্যালয়।

রূপে রূপবতী

মায়ায় মায়াবতী-

হে আমার মহাবিদ্যালয়

প্রাণের প্রিয় মহাবিদ্যালয়।

তোমার টিকরে পা দিতেই, মা

আকাশে নীলের ধ্রুবতা

চারপাশে শুধু হাহাকার

শুধু স্তুতি।

টাকাহারী সেই গাছ

টাবা ভরা সেই বাগান।

বুক ভরে হ্রাণ নেই

বৎসরের ক্লান্তি নেই আজ

শুধুই শান্তি।

নাম তোমার মহাবিদ্যালয়

আমার প্রিয় মহাবিদ্যালয়।

মন্তক ধোয়ানী, মা

তোমারে আমি ভুলি নি, মা

তোমায় ভুলিতে পারি না, মা

স্মৃতির শহরে তুমি-

মহাবিদ্যালয়, মা।

প্রাণের টেকনিক্যাল

বিশাখা পোদ্দার

নবম শ্রেণি

মিঞ্চ দুপুর একটু রোদুর দিয়েছে,

তুমি টেকনিক্যাল।

খোলা আকাশের নিচে প্রাণখোলা উচ্ছ্বাস দিয়েছে,

তুমি টেকনিক্যাল।

বটবৃক্ষের তরঙ্গতার নীরব ছায়া পাশে আছে,

তুমি টেকনিক্যাল।

হাসি, আড়ডা আর খুনঘুটিতে মিশে আছে,

তুমি টেকনিক্যাল।

একলা পথিক কে পথ চলতে শিথিয়েছে,

তুমি টেকনিক্যাল।

নীরব যাত্রার যাত্রী হয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে,

তুমি টেকনিক্যাল।

অঙ্ককারে আলো হয়ে পথ দেখিয়েছে,

তুমি টেকনিক্যাল।

অজানাকে জানতে শিথিয়েছে,

তুমি টেকনিক্যাল।

নিজীব জীবকে প্রাণ দিয়েছে,

তুমি টেকনিক্যাল।

নিরাশার নিরালায় আশার প্রদীপ জ্বালিয়েছে,

তুমি টেকনিক্যাল।

অসীম সীমানার রহস্য,

তুমি টেকনিক্যাল।

আমার ক্যানভাসের পরিপূরক,

তুমি টেকনিক্যাল।

আকাশ ছোয়ার স্ফুরণ,

তুমি “প্রাণের টেকনিক্যাল”।



সুবর্ণ জয়ন্তী

জামাতুল ফেরদৌস মৌরী
দশম শ্রেণী

৫ম পিরিয়ড। আজ সাদেকুল স্যার একটু দেরী করেই ক্লাসে এলেন। তারপর পড়ানো শেষ করে স্যার হঠাতে বললেন আগামী বছর আমরা টেকনিক্যালের ৫০ বছর পূর্তি পালন করব। মৌরী ক্যালকুলেটরে হিসাব করেও বুঝতে পারল না ২০১৭ থেকে ১৯৬৪ বিয়োগ করলে কীভাবে ৫০ হয়। তার বান্ধবীদের বলতে লাগলো, ‘কী হবে রে? নিশ্চয়ই সিঙ্গারা আর জিলাপি খাওয়ায় বাড়ি পাঠায় দিবে’। কিন্তু এক বছর পর যখন দিনটি এসেছিলো তখন তার ৪ পুরুষ কোনোদিন এমনটা ভাবতে পারে নি।

বলছি সেই সুবর্ণ জয়ন্তীর কথা। এই সুবর্ণ জয়ন্তীর জন্য কত যে প্যারা সহ্য করতে হয়েছে! কখনো পরিষ্কা বাদ দিয়ে স্যুটিং, কেউ রাতভর জেগে আলপনা করেছে। আর আমাদের টেকনিক্যালের শিল্পীরা তো আছেই। কিন্তু যে মা তার সন্তানের জন্য এত কিছু করল, সন্তানেরা তার জন্য এতটুকু কষ্টই সহ্য করতে পারবে না? চারদিকে সাজ সাজ রব, বিল্ডিংগুলোর ঘষামাজাই বলে দিছিলো এবার বড় কিছু হতে যাচ্ছে। একই সাথে আমরাও অপেক্ষার প্রহর গুণচিলাম।

নিজের সাজসজ্জা নিয়ে অনেক উত্তেজিত ছিলাম, কিন্তু অনুষ্ঠানের আগের দিনই আমার বোন বাসায় চলে গেলো। ব্যাস, শেষ হয়ে গেলো আমার সাজসজ্জা! বহু আকঞ্জিত এই দিনে ঘুম থেকে উঠেই মাথা খারাপ। ৭ টা ৪০ বাজে! স্যার না বলছে ৮টা সাড়ে ৮ টার মধ্যে উপস্থিত হতে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার খেতে, রেডি হতেই সাড়ে ৮ টা বেজে গেলো। ক্যাম্পাসে ঢুকেই আমার চোখ কপালে উঠে গেলো। বললাম না, আমার ৪ পুরুষ এমন কিছুর কথা ভাবতে পারে নি। আর ওয়াশরুমে অপেক্ষা করছিলো আরেক চমক, আমাদের বিশাল বড় আয়না।

র্যালিতে লাইন করানো হলেও শেষ পর্যন্ত লাইনগুলো ভেঙে চুরে শেষ হয়ে গেল। ছাত্রজনতা যে যার মত করে বিচ্ছন্ন হয়ে রাস্তার একপাশ দিয়ে হাটা শুরু করে দিল। এমন র্যালি কে বা কোনোদিন দেখেছিলো যেখানে আমাদের ৫০ বছর সিনিয়র থেকে এক বছরের জুনিয়র সবাই উপস্থিত ছিলো! র্যালি সামনে অগ্সর হচ্ছিলো এবং যথারীতি প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের পাগলামি শুরু। একই সাথে বাঁশির আওয়াজ

আর জ্ঞান, “আজাদ স্যার! আজাদ স্যার!” কেউ বা দিচ্ছে “পলাশ স্যার! পলাশ স্যার!” আর এক অসীম সাহসী তরংণদল জ্ঞান দিচ্ছে, “কবির স্যার! কবির স্যার!”! আর হোলির জাঁকজমতার কথা না-ই বা বললাম। ভাইয়াদের হাইড্রোলিক হর্ণের শব্দ শুনতে শুনতে র্যালিও শেষ হয়ে গেলো।

এরপর ব্রেকফাস্ট, তারপর লাথও অথচ ক্লাসরুমে। তবে আমরা একই সাথে ব্রেকফাস্ট ক্যারি করাতে ভলান্টিয়ার ভাইয়ারা বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলো। তারপর রাফা আর করবী তো আছেই। বাহির থেকে খাবার নিয়ে আসছে। ভলান্টিয়ার ভাইয়াদের মাথা এতই খারাপ হয়ে গিয়েছিলো যে তারা কোনো ভাবেই দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে পারছিলো না!

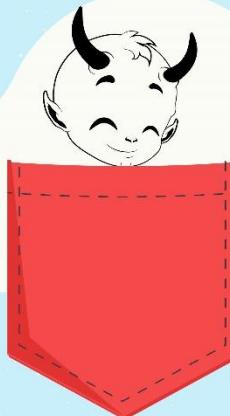
লাথ্বের বিরতিতে বাসায় চলে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি স্মৃতিচারণ চলছে। প্রাক্তনদের বাপসা বাপসা স্মৃতি এত বছর পরও আমাদের বিস্মিত করে চলছিলো। সন্ধায় মূল অনুষ্ঠানের পর্দা নামল স্কুলকে নিয়ে একটা ডকুমেন্টারির মাধ্যমে। তারপর স্কুলের থিম সং, রবীন্দ্র ও নজরুল সংগীত। এতসব গান শেষে একটি মাত্র নাচ। কিন্তু তখন সমস্ত লাইট অফ হয়ে গেলো। ব্যাস সমস্ত জনতার হাহাকার শুরু। ম্যাজিক শো তে মাইশার বাবাকে নিয়ে কম মজা হয়নি! তবে প্রাক্তনদের মধ্যে আসার সুযোগ আসলে তারাও তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করে দিলো। সবশেষে অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ বিলিক। বিলিকের বলকানি দেখে আমরা যথারীতি বাড়ি ফিরে গেলাম।



দ্বিতীয় দিনঃ ২৪ ডিসেম্বর

পরের দিন ৯টার মধ্যে তুকতে বলা হলেও আমি ৯টা ৩০ মিনিটে আমার যাত্রা শুরু করলাম। সৌভাগ্যক্রমে স্কুল তখনো ফাকা। কফি আনতে গিয়ে আরেক ঝামেলায় পড়ে গেলাম। মাইশা, রাইশা কাউকেই লাইনে খুঁজে পেলাম না। উপর থেকে আমার হাতে এতগুলা টোকেন! যখন গরমে একটা কফির কাপই সামলাতে পারলাম না, তখন ভাইয়াও বলা শুরু করে দিল, “একটাই সামলাতে পারো না, তাহলে ওতগুলা কীভাবে সামলাবা?” উপর থেকে আমার পিছনের আন্টিটা আমার সামনে চলে গেলো। হঠাৎ করে একটা আপু আমাকে সামনে আবিঙ্কার করে বলা শুরু করে দিলো, “এই, তুমি সামনে কোথা থেকে আসলা?” আমিও বাগড়া শুরু করে দিলাম, “আপু, আমি তো সামনেই ছিলাম।”

দেখতে দেখতে দুপুর হয়ে গেলো। কিন্তু আজ সহজে খাবার পাওয়া গেলো না। লাইনের শেষ মাথা খুঁজে পাওয়া কষ্টকর ছিলো। তবে এত ঝামেলায়ও আমার হাসি পাছিল। কেননা সব রাগ তো সকালেই ঘোড়ে ফেলছি। এত রাগ আসবে কোথা থেকে! আর আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজ শেষ হওয়ার আগে বিরতিই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু শীতবন্দের অভাবে আমাকে আবার বাড়ি দৌড় দিতে হল। এত দৌড়াদৌড়ি করে বাসায় এসে সব কেমন জানি এলোমেলো লাগছিল। তবে লাপাত্তা বুশরা হককে খুঁজতে আমাকে কম পুলিশি জিজ্ঞাসাদের সম্মুখীন হতে হয় নি! আজকের দিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিলো র্যাম্প শো। যা মূলত ছিলো ২০১১ থেকে ২০১৪ সালের এস.এস.সি ব্যাচকে নিয়ে। আমার মনে হয় জরিপ করলে অধিকাংশই বলত এই র্যাম্প শো-ই সবচেয়ে ভালো ছিলো। লটারির সময় ভাইয়াদের কর্মকাণ্ড আমাকে কম বিনোদন দেয় নি। মনে হচ্ছিল পৃথিবীর সব লটারি মনে হয় ভাইয়ারাই কিনে রাখছে। সবশেষে আগমন ঘটলো ওয়ারফেজের। হতাশা, অসামাজিক অবশ্য আমাদের কম বিস্মিত করে নি। কি তারপর? বিদায়ের সেই অগ্রিম সময়টি এসে গেল। টেকনিক্যালের জীবন থেকে ৫৩ টা বছর কেটে গেলো.....



পকেট ছেড়া

মায়িশা বিনতে মোস্তফা
দশম শ্রেণী

১৫ ই সেপ্টেম্বর, ২০১৮। তখন ক্লাস এইট এ পড়ি। টিফিনের আগের ক্লাসে বুশরা আমার পকেটে বাদামের খোসা তুকিয়ে দিল। হায়রে জ্বালা... ছোটো খাটো গুড়া সহজে বের ও হতে চায় না।

পকেট পরিষ্কার করার জন্য অন্য সব জিনিসের সাথে চাবিও বের করে ব্রেঙ্গ এ রাখলাম কিন্তু তা পরে নিতে গেলাম ভুলে। এই সুযোগে তাবাসসুম চাবিটা বুশরাকে দিয়ে দিল। টিফিন পিরিয়ডে রুটিন মাফিক রেজিস্টার করা মেহেগুনি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে গল্প করছি। আমরা চারজন (আমি, বুশরা, আশা, হুমায়রা)। বাকি তিনজনের হাব ভাব ঠিক ঠেকছে না। তার উপর বুশরা মুচকি মুচকি হাসি দেখে বুবলাম আমার কিছু একটা মারছে তারা। Something is কালা কালা in the ডাইল।

পকেটে হাত ঢুকানোর সাথে সাথেই বুবলাম আমার চাবি বুশরার কাছে। সব কিছু বুঝতে পারায় সবাই এখন সাবধান। আমি শুধু একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। বুশরা অন্য মনস্ক। তাই আমি যে গল্প করতে করতে ওর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম ওটা ও বুঝতে পারে নাই। সুযোগ বুঝে আমিও ওর পকেটে হাত ঢুকায় দিলাম। চাবিও পেলাম। ঠিক বুশরাও দিল টান। ফরাততত...।

দুজনেই হা হয়ে চেয়ে আছি। বুশরার পকেট অর্ধেক ছেড়া! পকেট ছেড়ার শোকে আমরাও ৩০ সেকেন্ড নিরবতা পালন করলাম। এই সুযোগে চাবিটাও তুলে নিলাম। বুশরা তখন চেচানো শুরু করলো। তবে ঘণ্টা পড়ে যাওয়ায় বেশিক্ষণ চিঙ্গাচিঙ্গি করতে পারলো না। আমরা ক্লাসে ফিরে আসলাম। বুশরা আবার শুরু করলো। কিন্তু পাত্তা না পাওয়ায় চুপ হয়ে গেল। স্যার ম্যামরা মিটিং এ ছিলেন তাই বুশরা আব কাব্য ক্লাস কন্ট্রোল করার চেষ্টা করলো। বুশরা এবার ক্যাপ্টেন গিরি শুরু করলো। আমরা তিন কিছু বললেই বলে

“চুপ কর, কথা বলিস না, স্যার আসলে তো আমাকেই বলবেন।” কিন্তু সামনের গুলা যে চিঙ্গায় গলা ফাটাচ্ছে সেটা ওর কানে যায় না। সেদিনের মত দুইটা ফাঁকা ক্লাস করে বাসা গেলাম।

পরবর্তী দিন। আমরা গল্প করছি আব বুশরা কে avoid করছি। অবশ্যে বেচারী কেঁদেই দিল। আবার সব ঠিক ঠাক। কোচিং শেষে আমরা নিচে নামলাম। কথায় কথায় আগের দিনের কথা উঠলো। আমরা ভাবলাম বুশরা হয়ত চেঁচা মেচি করবে। এমন সময় বুশরা আমার এপ্রনের পকেট ধরে দিল টান। আমরা তিন জনেই থ। হলো টা কি!

আমি: তুই এখন আমার টা ছিড়লি কেন?

বুশরা: আবে থাম.... বলেই আরেকটা পকেট ধরে টান দিল।

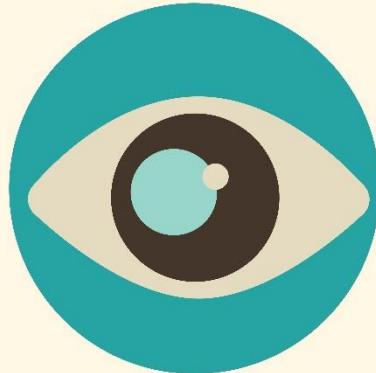
এবার দুই পাশেই ফাঁকা। আমিও কম না। বুশরার আরেকটা পকেট ছিড়ে দিলাম আমি। এবার? এবার দুজনেই বাকি দুজনের দিকে তাকিয়ে একটা সুন্দর হাসি দিলাম। আমার আব বুশরার মাথায় একটাই ভাবনা, আমাদেরটা ছিড়ছে, তাদেরটা বাকি থাকবে কেন! প্রথম টার্গেট হুমু। একদিক দিয়ে আমি অন্য দিক দিয়ে বুশরা। বিনা লড়াইয়ে সারেন্ডার! এবার আশা। ধরতে যাবো কি! তার আগেই marathon দৌড়। আমিও দিলাম দৌড় অর্ধেক মাঠ দৌড়ে, অবশ্যে আশাৰ পকেটও সাফ! এবার ক্লাসে গেলাম। ক্লাসে আমাদের হাসি দেখে বাকি তিনজনের সঙ্গেই হল। তাই সাথে সাথে কিছু করলাম না। ২য় পিরিয়ড শেষ গল্প করতে করতে আমি আব আশা, রাইসা আব তাবাসসুমের পাশে গিয়ে দাঢ়ালাম। আব সুযোগ বুঝে দিলাম টান। সাথে সাথে একটি করে পকেট আমাদের হাতে চলে আসলো। পরবর্তীতে বাকি পকেট টিও শহীদ হলো। বেচারি মৌরি সেদিন আমাদের ভয়ে আশা আব হুমকে রেখে বাড়ি পালিয়ে যায়!

টেকনিক্যাল নিরীক্ষণ :

অভিজ্ঞতা বর্ণন

মো. সোহেল আরমান

প্রভাষক, সৈয়দপুর সরকারি কারিগরী মহাবিদ্যালয়



শিরোনামটি এমনও হতে পারে 'আমার দেখা সৈয়দপুর সরকারি কারিগরী কলেজ'। একটি বিস্ময়কর অধিয় সত্য হলো ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে সৈ.স.কাক. সম্পর্কে আমি মোটেও অবগত ছিলাম না! বিবাহ বিষয়ক জটিলতায় কনের শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাই-বাচাইয়ে দেখতে পেলাম তিনি সৈ.স.কাক. হতে ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে উচ্চ-মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ। ৩৪তম বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে উত্তীর্ণ হওয়ার পর শুশ্রার ভগিনী তার ভাগিনীকে অর্থাৎ আমার বর্তমান অর্ধাসীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন 'জামাইকে টেকনিক্যাল কলেজে পোস্টং নিতে বলো'। আমি পরামর্শটি একেবারেই পাত্তা না দিয়ে মেধাতালিকা অনুযায়ী 'রংপুর কারমাইকেল কলেজ' এ পদায়ন পাবো বলে আশাবাদী ও আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। অথচ গেজেট জারি হলো; আমার পদায়ন হলো 'পীরগঞ্জ সরকারি কলেজ, ঠাকুরগাঁও' এ।

হোঁচ্ট খেতে বেশিদিন লাগেনি। কিছুদিনের মধ্যে অনুধাবন করলাম; আমার ছাত্রদের শিক্ষার্থী হিসেবে মান তেমন ভালো নয়। তবে আমার বাংলা বিভাগের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির শিক্ষার্থীরা খুব ভদ্র ও মার্জিত ছিল। তাদের সাথে আমার

রসায়ন চমৎকার, আর আমাদের সম্পর্কও আজীবন অল্পান থাকবে। ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে সৈয়দপুরে এসে ভাড়া বাড়িতে থাকা শুরু করি; তখন হতে সৈ.স.কাক. সম্পর্কে আমার জ্ঞানশোনা বাড়তে থাকে। পূর্বতন কলেজ নিয়ে আমার দ্বিধা ও দূরত্বের বিষয়টি পরিবারে আলোচনা হলে আপনজনদের একটা অংশ টেকনিক্যালকে বেছে নিতে বলেন। ছোট কলেজ হিসেবে অনেকের আপত্তি সত্ত্বেও এবার তাদের পরামর্শ আমলে নিয়ে বদলি আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ৩০ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করি।

এখন প্রশ্ন হলো- যে অস্তিত্ব দূর করার জন্য আমার সৈ.স.কাক.কলেজে আসা, তা কতটুকু সার্থকতা পেয়েছে? উত্তর হলো- ভগ্নাংশ তথা আংশিক পূরণ হয়েছে। আমি দীর্ঘদিন (৫ বছর+) ক্যাডেট কলেজে (বরিশাল ও রংপুর) শিক্ষকতা করার সময়ে মেধাবী-তুখোড় ছাত্রদের নিয়ে কাজ করার সুবাদে আমার প্রত্যাশার মাত্রা হয়তো অন্যদের চেয়ে বেশি। তুলনা না করাই ভালো, তবে পরিসংখ্যানের একটি সারাংশ আমাদের ভালোর জন্যই জানা জরুরি বলে মনে করছি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার্থী (এক বছরে)	জিপিএ-৫	পরবর্তী ধাপ	সাফল্যের হার	শৃঙ্খলা
সৈ.স.কাক.	২৭০+	১৭০+	সরকারি মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়- ১৬০+	৬০%+	৭০%+
ক্যাডেট কলেজ (১২টি)	৬০০+	৫৯০+	প্রতিরক্ষা (সেনা, নৌ, বিমান) বাহিনীতে কর্মশনপ্রাপ্তি-৫০০+ সরকারি মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়- ১০০+	৯৯.৯৯%	১০০%

মূল্যবোধ সৃষ্টির বিষয়টিকে আমি হিসেবের বাইরে রেখেছি কেননা মানবতা ও সাম্যের বাণী এখন বেশি মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে না। তাছাড়া মূল্যবোধের মাত্রা পরিমাপের দৃশ্যমান কোনো মানদণ্ড নেই, সেটি আপেক্ষিক; যদিও শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান বিতরণ নয়; মূল্যবোধ সৃষ্টি করা, সুনাগরিক তৈরি করা, সুশৃঙ্খল করা। আমি শৃঙ্খলার ব্যাপারটিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি; কারণ যার জীবনে শৃঙ্খলা নেই, তার দ্বারা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি স্বাভাবিক।

ব্যাপক সুনাম ও সুখ্যাতির পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠানটি অনেক সফল মানুষ তৈরির কারখানা হিসেবে ভূমিকা রেখে চলেছে। বিড়ম্বনা হলো- প্রতিষ্ঠানটিতে স্নাতক ও স্নাতক (সম্মান) শ্রেণি চাহিদা থাকা সত্ত্বেও না থাকা। এ এক বিরাট শূন্যতা! এজন্যে একাধিকবার জেলা সদরের বড় কলেজে চলে যাওয়ারও উদ্যোগ নিয়েছিলাম। ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে কোথায় যেনো একটা টান পড়ে; আর অগ্রসর হতে পারি না। আসলে

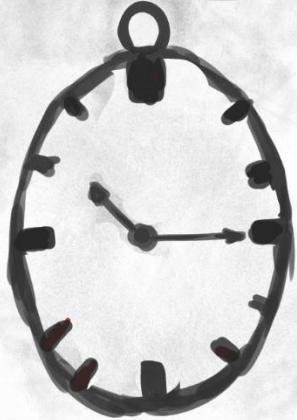
না করতে করতেও কীভাবে যেনো একটি প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। এখানকার শিক্ষার্থী, শিক্ষক-কর্মকর্তা, কর্মচারী, অবকাঠামো, মাঠ, ঘাস, পুকুর, গাছপালা... সবই আপন মনে হয়। কলেজটির সার্বিক কল্যাণের জন্য মন থেকে একটা তাগিদ অনুভব করি। আমি চাই সকল প্রকার ভেজালমুক্ত একটি সাম্য ও শান্তির পরিবেশ; যা আমি নিজের বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করবো।

এখানকার শিক্ষার্থীরা অবশ্যই মেধাবী। আমার প্রত্যাশা হলো- শিক্ষার্থীরা বিদ্যার্জনের পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধের চর্চা করুক, সুখী-সম্মুক্ষ সোনার বাংলা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখুক।

(পুনর্শ: ‘দুরন্ত’ ম্যাগাজিনের প্রচ্ছ দেখার জন্য আমার কাছে ই-মেইল পাঠানো হয়, তোমাদের লেখা পড়ে আমি মুঞ্চ! তাই অনুপ্রাণিত হয়ে নিজে লেখার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।)

মাস্টারমশাই - ১

সাদাত মাহরুব
এস.এস.সি ২০১৬



শুনরে বগা, কানটা খুলে শুনতে যদি চাস
হাইক্ষুলের কথা হঠাত, পড়ল মনে আজ
দশটার ক্লাসে চুকতে আমার পনের মিনিট হত দেরি
দেরি কেন হত? দাঢ়া বলছি, তুই বড় অধৈর্য দেখি!
দশটা কিলো পাড়ি দিতাম, রোজ সকালে তখন
আলসে ছিলাম, উহু, দূরে থাকতাম এটাই আসল কারন!

ভাগ্যে ছিল এমন একজন ক্লাস টিচার তখন
অন্নেক ভাল, একদম তোর গোপাল দাদার মতন।
বদরগুল স্যার, আমার বড় প্রিয় তখন নিতেন ক্লাস
নীল রঙ্গ এক বাইকে চড়ে পেতেন বড়েই আশ
ক্লিন শেভ আর শার্ট প্যান্টে স্যারকে লাগত বেশ
মুখে হাসি লেগেই থাকে, মাথায় সাদাকালো কেশ।
স্যাকে কেউ বকতে দেখেনি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারিস
তাইতো তিনি প্রিয় সবার, কেউ করেনা নালিশ।

খুব জোর বেঁচে গেছি, স্যার ছিলেন বলে
একটু বকেই ছেড়ে দিতেন, আমিও যেতাম বেঁচে।
তাই বলে যে ভয় দেখাতেন না তা কিন্তু নয়
মিষ্টি মধুর কষ্টে বিধুর ভবিষ্যতের যত ভয়।
গল্প শোনান, সাহস দেখান, করতে বিশ্বজয়
আমরা খালি চিন্তায় থাকি, “এ প্লাস” টা পেলেই তো হয়।

তখন বড়ই ভয়ে থাকতাম মিস যদি হয় “প্লাস”
অনেক “সাধনার” ইশকুল থেকে ফের যদি করে খালাস!
চোখে চশমা হাতে বায়োলজি বোঝান বইয়ের ভাষা
ভদ্র হয়ে শুনি সবাই, নম্বর টাও দিতেন খাসা।
পান খান মাবেমধ্যে, তবে কবির স্যারের মত নয়
ওহো! কবির স্যারের কথাও যে না বললেই নয়!
আজ এটুকুই, একদিন বলব কবির স্যারকে নিয়েও
দেখেছিস বগা, ভুলিনি প্রিয় স্যারদের কথা,
হাজার বছর গিয়েও!



স্বপ্নের টেকনিক্যাল - প্রাণের টেকনিক্যাল: পর্ব-১

‘এইটি পাশ, ফাইড ফেল স্বপ্ন শুধুই টেকনিক্যাল’

মোঃ হাবিবুর রহমান (হাবিব ওরফে সোহেল রানা)

এইচ.এস.সি ২০১১

প্রভাষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি
কালিয়াকৈর, গাজীপুর

সময়টা ২০০০ এর পর থেকে ২০০১ সালের মধ্যে হবে। আমি তখন গ্রামের স্কুলে ক্লাস ফাইভ বা সিঙ্গে পড়ি। বাবার সাথে প্রায়ই সাইকেল এর পিছনে চেপে সৈয়দপুরে আসতাম জিন্সের হাফ প্যান্ট (নিচের দিকে ঝুল থাকতো) কেনার জন্য। বিভিন্ন খেলনাও কিনতাম। সেই সময় পাঁচমাথার মোড়ে জিকরল হক রোডের দিকে এক বয়স্ক ভদ্রলোক এর সাইকেল এর দোকানে (সাইকেল রিপিয়ারিং ও ওয়েল্ডিং এর কাজ করতো) সাইকেল রাখতেন বাবা। আমাকে সেই দোকানে বসিয়ে রেখে বাবা বাড়ির সবগুলো খরচ করে আমাকে নিয়ে বাসায় ফেরার আগে সেই জিন্সের প্যান্ট ও খেলনা কিনতে যেতেন। যে সময় আমি ওই দোকানটাতে বসে থাকতাম তখন দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত লায়ন্স, ক্যান্ট ও টেকনিক্যাল এর শিক্ষার্থীরা স্কুল ছুটির পর সাইকেলে করে একজন আর একজনের সাইকেলে বা গলায় হাত দিয়ে গল্ল করতে করতে বাসায় ফিরতো। গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতাম তাদেরকে। আর কল্পনার গভীরে চলে যেতাম। আহ! আমার যদি এমন একটা লাল রংয়ের সাইকেল থাকতো! আমারও যদি এই রকম একটা স্কুলে পড়ার সৌভাগ্য হইতো! আমারো যদি এমন একটা দুরন্ত শৈশব থাকতো! সব থেকে বেশি টানতো সেই খাকি ইউনিফর্মটা। পরে বাবার কাছে জানতে পারি এটা টেকনিক্যাল এর শিক্ষার্থীদের ড্রেস। ২০০২ অথবা ২০০৩ সালের দিকে কোন এক ফাগুনের প্রথর রোদে, দুপুর বেলা সেই দোকানে বসে আছি। আমি তখন

হয়তো ক্লাস সেভেন বা এইটে পড়ি। বরাবরের মতো সেদিনও মন খারাপ করে তাজির হোটেলে বাবা সহ গরুর মাংস দিয়ে ভাত খাইতেছি। আমার মনে শুধু সেই দুরন্ত কিশোরদের সাইকেল চালানো হাসি-খুশি দৃশ্যই ভাসছে। তাজিরের সেই বিখ্যাত রান্না যেন আমার কাছে বিরক্তিকর মনে হচ্ছে! মনে শুধু টেকনিক্যাল এর স্বপ্নই ঘূরছে। সেদিনের মতো খাওয়া শেষ করে সাইকেলে চেপে বাবার সাথে বাড়ি ফিরছি।



বাবার একটা বিশ্বাস ছিলো যে ভালো পড়াশোনা পারে সে যেকোন যায়গা থেকেই ভালো কিছু করতে পারবে। আর আমি মনে করতাম (এখনো করি) শিক্ষার একটা ভালো পরিবেশ মানুষের শেখার পরিধি অনেক গুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই বাবার কাছে আবদারও করতে পারতাম না

শহরের স্কুলে পড়বো বলে। একদিকে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান অন্যদিকে বাবার সাথে আমার বিশ্বাস এর দ্বিমত। সাইকেল চলছে তার আপন গতিতে আর আমি মনে মনে এসব ভাবছি। চওড়া বাজার পার হয়ে, এক বুক সাহস নিয়ে বাবাকে জানালাম শহরের স্কুলে পড়বো (বিশেষ করে টেকনিক্যাল)। এর আগেও বাবার এক কলিগ আমার পড়াশোনার আগ্রহ দেখে বাবাকে বলেছিলেন আমাকে শহরের স্কুলে পড়তে। কিন্তু বাবা অতোটা গুরুত্ব দেয় নাই। তো সেদিন বাবা আমার এমন ইচ্ছা দেখে আমাকে আর না করতে পারে নাই। ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে টেকনিক্যাল এর ক্লাস সিক্স আর ক্যান্ট এ ক্লাস সেভেন এর ফর্ম তুললাম।

যেহেতু গ্রামের স্কুলে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিলাম তাই ৩ বছর নষ্ট করতে চাই নাই, বিধায় ক্যান্ট এ ক্লাস সেভেন আর টেকনিক্যাল এ যেহেতু ক্লাস সিক্সে বেশি স্টুডেন্ট নেয় (মনে মনে কইছিলাম ক্লাস এইট পড়ে এসে ক্লাস সিক্সে অনায়াসে চাঙ পাবো!) তাই সিক্সের ফর্ম নিয়েছিলাম। ক্লাস এইট পড়লেও কি আর ক্লাস ফাইভের বই ১ মাস পড়ে ক্লাস সিক্সে চাঙ পাওয়া যায়? তাও আবার টেকনিক্যাল এ!

(চলবে)





আয়েশা তাবাসসুম

দশম শ্রেণি

ম্যাগাজিনের জন্য রচিত

মুজাদিন ইসলাম চৌধুরী
দাদশ শ্রেণী

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ‘সৈয়দপুর সরকারি কারিগরি কলেজ’-কে নিয়ে লিখার দুঃসাহস করব না। এর তুলনা শুধু এটি নিজেই। একে বিশেষায়িত করার মতো দুঃসাহসিক শব্দমালা আজও আমার জ্ঞানভান্ডারকে সম্মুখ করতে পারে নি। সেই মহাকাব্যের লেখক হওয়ার স্বপ্ন দেখাও আমার যোগ্যতার উপর বিরুদ্ধাচারণ ছাড়া কিছুই নয়। তবে দীর্ঘ সাতটি বছরের এই মহাকাব্যের কিছু খণ্ডিত তুলে ধরার চেষ্টা করব।

পুঁথিগত বিদ্যার দিক্ষা প্রদান যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য নৈমিত্তিক একটি ব্যাপার। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাহিরেও একটি শিক্ষার্থীর একজন মানুষ হিসেবে জাতি, সমাজ তথা রাষ্ট্রের উপর কিছু মানবিক দায়িত্ব বর্তায়। যেগুলো একজন মানুষের সত্ত্বাকে সম্মুখ করে। টেকনিক্যাল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে একজন শিক্ষার্থীর মাঝে এই মানবিক গুনাবলিগুলোর বীজ বোনা হয়। শুধু বীজ বুনলেই তো গাছে ফল ধরবেনা! তাই অঙ্কুরোদগম থেকে শুরু করে ফল ধরা পর্যন্ত বুক উজার করে মাত্রন্মে লালন করে আমাদের এই জ্ঞানের বাতিঘর।

আমার কাছে টেকনিক্যাল শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়। এটি একটি পরিবার এবং যে পরিবারের প্রতিটি সদস্য একেকজন সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী। পরিবারের একজন সদস্যের ব্যাথা যেমন পুরো পরিবারের হৃদয় নিংড়ে অশ্রু আনে ঠিক তেমনই এই পরিবারের সকল সদস্য সমাজের দুর্দশায় ব্যথিত হয়। বাঁপিয়ে পড়ে আর্ত মানবতার সেবায়।



গতবার বন্যার তান্ত্রিকীলা কিংবা শীতের রুক্ষতায় যার প্রতিফলন আমরা দেখেছি। অসামান্য সাহসকে পুঁজি করে যার যতটুকু ছিলো ততটুকু দিয়ে বিভিন্ন দুর্গত অঞ্চলে উপহার সামগ্ৰী পৌঁছে দিয়েছে আমার পরিবারের কিছু অকুতোভয় সৈনিক। আবার বর্তমানে যখন কোভিড-১৯ এর করালগ্রাসী থাবায় পুরো পৃথিবী নাস্তানাবুদ তখন আমাদেরই কয়েকজন সহ্যাত্মী- অঞ্জ-অনুজ বাঁপিয়ে পড়েছে খালিহাতে এই মারণঘাতীকে প্রতিহত করতে।

সৈয়দপুরে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে কলেজ ল্যাবে দুদিনে প্রায় চার হাজার বোতল হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরী করে বিভিন্ন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে বিতরণ করেছে। ব্যাংক, হাসপাতাল, উপজেলা, পুলিশ প্রশাসন সহ বিভিন্ন জনসমাগমপূর্ণ স্থানে বিনামূল্যে প্রদান করেছে। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী যখন এই সংকটকালীন মুহূর্তে খাদ্যাভাবে অনাহারে থেকেছে এই ছোট প্রতিষ্ঠানটি সৈয়দপুরের প্রতিটি ওয়ার্ডভিত্তিক হতদরিদ্র মানুষের তালিকা তৈরী পূর্বক সাহায্য প্রদান করেছে। শারীরিক সীমাবদ্ধতাকেও অনেকে ঘাড় বাঁকিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেতে মানবতার সেবায় বাঁপিয়ে পড়েছে। এসব ক্ষেত্রে মানুষের দোয়া এবং চোখের জলের যে কৃতজ্ঞতা এবং সম্মান একজন টেকনিক্যালিয়ান পেয়েছে সেটাই তো সবার থেকে আমার এই প্রাণের প্রতিষ্ঠানকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট এবং এখানেই আমাদের ব্যক্তিজীবনের সফলতা অন্তর্নিহিত। এমনই হাজারো মানবতার গঞ্জের চাদরে মোড়া আমাদের এই পরিবার।

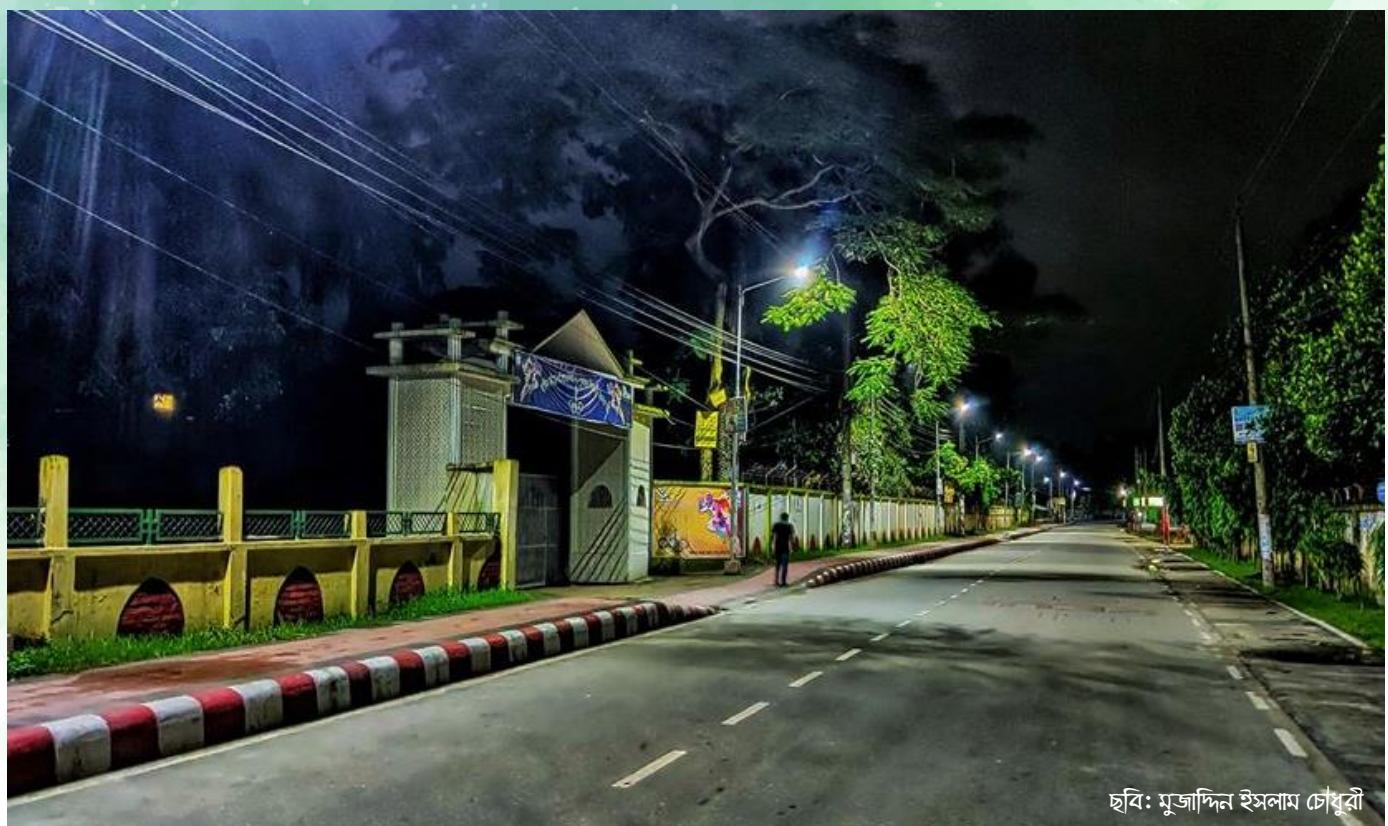
আমাদের পুঁথিগত শিক্ষার দায়ভার আমরা আবার ওই টেকনিক্যালের হাতে তুলে দিয়েই প্রতিরাতে স্বত্ত্বে ঘুমোই। কারণ আমরা জানি - এই টেকনিক্যাল এক্ষেত্রেও আমাদের আলোর পথের দিশারী। এক্ষেত্রেও টেকনিক্যাল অপ্রতিরোধ্য, দুর্নিবার।

সবশেষে- এখানে একই সাথে বিনামূল্যে পাঠদান এবং কোটি টাকা ব্যয়ে একেকটি অনুষ্ঠানও হয়। কারণ- ওই যে বিনামূল্যে পাঠ নেয়া শিক্ষার্থীগুলো একদিন অমূল্য হয়ে ওঠে। গড়ে তোলে একেকজন সমৃদ্ধ অ্যালামনাই।

আমাদের ব্যাচ (এস.এস.সি'১৮) নিয়ে কিছু কথা

দিনটা ছিল ১২ই জানুয়ারী, ২০১৩। আমাদের জীবনের এক মাহেন্দ্রক্ষণ। হাঁ, এইদিনই আমরা দীর্ঘ সাতটি বছরের সম্মিলিত মহাকাব্যের অংশ হতে পা রেখেছিলাম প্রাণপ্রিয় টেকনিক্যাল প্রাঙ্গণে। একেকজন গায়ে জড়িয়েছিলাম চিরস্মৃত ভালোবাসার সাদা-খাকী কিংবা সাদা-ছাই রঙের গর্বের পোষাক। ঘাড়ের নীল ব্যাচ দুটো পোষাকের মর্যাদার ওজন বহুলাংশে বাড়িয়ে আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে সফলতার বীজ বুনে দিয়েছিল। অতঃপর সেই বীজের সুপ্তাবস্থা থেকে পরিচর্যায় আমরা পাশে পেয়েছিলাম কিছু শ্রদ্ধাভাজন মুখ। যাঁদের পিতৃ ও মাতৃসম মেহ ও ভালোবাসায় আমাদের সংকীর্ণতা শক্তিতে রূপান্তরিত হতে আরম্ভ করে এবং সেই সফলতার বীজের অঙ্কুরিত গাছের প্রস্ফুটিত ফুলস্বরূপ আমরা জে.এস.সি'তে উপহার দিতে পেরেছিলাম টেকনিক্যালের তৎকালীন ইতিহাসের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি। সেই ফুলই আবার ফলের রূপান্তর ঘটিয়েছিল আমাদের এস.এস.সি. ফলাফলে।

পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের সফলতার সেই সব কারিগরদের। সময়ের পরিক্রমায় যাঁদের নিরলস পরিশ্রমের ফসল আমরা। টেকনিক্যাল শুধু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নয় এটা একটি পরিবার। তড়িৎ গতিতে একজন আগন্তুককে কোনো প্রতিষ্ঠান যে কতটা আপন করে নিতে পারে তার বাস্তব উদাহরণ এই স্বন্ধের ঠিকানা। আমি স্মৃতিচারণ করব না। একটি ছয় বছরের পরিবারের রচিত মহাকাব্যের স্মৃতিচারণের বিপরীতে প্রয়োজন অসীম পরিমান কাগজ ও কলম। যা যোগানো আমার সাধ্যাতীত। দীর্ঘ ছয় বছর অতিক্রম করতে গিয়ে অনেকের মনে হয়ত বেত্রাঘাত করে রঙ্গাঙ্ক করে ফেলেছি। সেই রঙ্গের প্রতিদান হয়ত কখনও দিতে পারব না। তবুও আঁকুতি থাকবে - আমাদের দোষগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাদের সফলতার ধারা অব্যহত রাখতে আমাদের আশীর্বাদ করবেন। ভালোবাসি টেকনিক্যাল।



ছবি: মুজাদ্দিন ইসলাম চৌধুরী

স্বর্ণালী অঙ্গতি: আমার চোখে টেকনিক্যাল

লাবিব শাহ

এস.এস.সি ২০১৭

টেকনিক্যাল এইচএসসি ব্যাচ ২০১৯। আমার অঙ্গতি, আবেগ সবচেয়ে শুরু। সব পাওয়ার ইতিহাস যদি শুরু করতে হয় তাহলে আমি বেছে নেব প্রিয় এই অঙ্গনটাকে। যা পেয়েছি তা হয়তো কখনো ভূলব না। কিন্তু যা দিয়েছি তা নিয়ে আক্ষেপ আছে। হয়তো আর কিছু অর্জন যোগ হতে পারতো স্মৃতির পালকে।

যদি বলা হয় কি মিস করছো সবথেকে বেশি? তাহলে বলব প্রিয় ক্যাম্পাসটাকে মিস করছি, মিস করছি বন্ধু আবির, ফুয়াদ, মিরান, তৌসিফ, নওরোজ তোদের। তোদের সাথে কাটানো আমার প্রতিটা মুহূর্তই সেরা। তোরা আমারই অংশ। মিস করি ছোটভাই পীতাম্বর, সরণ, বাশার, তমাল, আলী, তন্ময়, রাফি, শাওন, তৌফিক। তোরা আমার কাছে বিশেষ কিছু। মায়মুন, ইনান, মেরাজ, শাহ আলম, আবির, রাবির বন্ধু তোমরা এই ১৯ ব্যাচের আবিক্ষার। তোরা ছাড়া আমি কিছুই ছিলাম না।

খুব মিস করি লিচুবাগান, ডি বক্সের আড়ডা, বটতলা, পুকুরপাড়ের আড়ডা। মিস করছি বৃষ্টির দিনে মাঠে অবিরাম খেলাটাকে। মিস করছি বিকেল হলেই মাঠের খেলাটাকে। মনে পড়ছে জীবন, দীপ্তি, সাকিব, বুলবুল, লেগিন, মেসবাহ, সিয়াম ছাড়া ভলিবল জমতই নাহ। ঠিক তেমনি মুহিত, সাকিব, আকরাম, রাকিব, বুলবুল, ছোটভাই মুন্না, সালাউদ্দিন, মাহিম, সজীব, রিফাত, রাকিব ছাড়া ফুটবলটা জমে উঠত না। আবার যদি ক্রিকেটের কথা বলা হয় তাহলে সাকিব, মেরাজ, জুনাইদ, নওরোজ এদের কথা বলতেই হয়। এরা ছিল কলেজের ক্রিকেট কান্ডারী। ক্রিকেটে এরা কলেজকে নিয়ে গিয়েছিল অনন্য উচ্চতায়।

এবার আসি পড়ালেখার কথায়। জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সময়টা কাটিয়েছি এই ক্যাম্পাসে। কুলের কথা যদি বলতেই হয় তাহলে আউয়াল স্যার আর হাফিজ স্যার আমার সবসময়ের অনুপ্রেরণা। আরিফ স্যার, পলাশ স্যার, জেরিন ম্যাম আমার স্বপ্ন দেখানোর কারিগর।

কলেজে যদি একদিনও ক্লাস করে থাকি তাহলে মিস করি আতাউর স্যারের পার্সোনালিটি, মিস করি কামরুন্নেসা ম্যামের হাসি আর রোলকল, দেলোয়ার স্যারের ক্যামেস্ট্রি, জাকির স্যারের মিষ্টি শাসন, সাদিক স্যারের বন্ধুসুলভ আচরণ, আর আরমান স্যারের সাহস জাগানিয়া হাসি। যদি মিস করি বলি তাহলে মিস করি আনসারুল স্যারের ক্লাসে হাতে তালি দেয়াটা। আর মিস করি আজাদ স্যারের ক্লাসে বুঁধি অথবা না বুঁধি, তবুও মনোযোগী হয়ে থাকাটাকে! এই লোকটি আমার কাছে বিশেষ একজন। আমার অন্যতম অনুপ্রেরণা।

কল্পনার বসেও যদি কখনো কলেজ জীবনে ফিরে যাই তাহলে সবার আগে যাই প্রিসিপাল স্যারের বাংলা ক্লাসটাতে। যদি কখনো প্রশ্ন করা হয়, কলেজ জীবনের সেরা অর্জন কি? উত্তরে বলব প্রিসিপাল স্যারের ক্লাস করেছি। স্মৃতির পাতা থেকে যদি কখনো পরীক্ষার কথা মনে পড়ে তাহলে নিজেই শিউরে উঠে এরশাদ স্যার, বাবলী ম্যামের গার্ডে পাশ করে এসেছি! এই মানুষগুলাই আমাকে আমার মতো করে চলতে শিখিয়েছে।

টেকনিক্যাল যদি আমার মহাকাশ হয় তাহলে তার মূল গ্রহ হলো ছাত্রাবাস। এ যেন এক অন্য জগত। সকলে স্বমহিমায় উজ্জ্বল। যদি বলি হোস্টেলের কি সবথেকে বেশি মিস করি?

তাহলে বলব কোনো বিশেষ জিনিস নয় আমি নয়ন, কামিয়াব, সিফাত, ছোটভাই টক্সি, গালিব, তৌফিক, অভি, বন্ধু দীপ্তি, শাহারিয়া, সাকিব, আকরাম, নিরব, মিনার, পাঞ্চু, ছোটভাই অর্পন, মামুন তোদের মিস করি। কোনোকিছুই তোদের ছাড়া সম্ভব ছিল নাহ। আর যদি বড়ভাইদের কথা বলি যারা আমার সবসময়ের অনুপ্রেরণা, আমার পথদিশারী তারা হলেন সিয়াম ভাই, মারুফ ভাই, হারুন ভাই, রণি ভাই, ফাহিম ভাই, আল আমিন ভাই, ফরহাদ ভাই, তাওহীদ ভাই, ইওহেদ ভাই, হুদয় ভাই, আতিক ভাই, ফেরদৌস ভাই, ওয়াদুদ ভাই, আদিত্য ভাই, ইমতিয়াজ ভাই, রাসেল ভাই, জামিল ভাই। ভাই আপনারা আমার কাছে বিশেষ কিছু। টেকনিক্যাল হোস্টেল আপনাদের ভুলবে নাহ। আপনারা জিনিয়াস।

পপুও আংকেল, ফারুক ভাই আর আজিজ স্যার আমার অভিভাবক ছিলেন। তারাই আমাকে আমি বানিয়েছেন। কলেজের প্রত্যেকটা প্রোগাম বা অনুষ্ঠানে আমাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। কলেজে মাইম, আর নাটক ছিল আমার জীবনের অন্যতম অর্জন। মেহেদী, জীবন, মিশুক, তন্ময়, তৌফিক, সজীব, টক্সি তোদের সাথে মাইম করাটা আমার সেরা মূহূর্ত। কলেজ হয়তো অনেক মেধাবী পাবে কিন্তু সাকিব, ছোটভাই শাকিল, মুন্না, বন্ধু আকাশ, মিশুকদের মতো ক্রীড়াবিদ হয়তো আর পাবে নাহ। প্রিয় অঙ্গন ছেড়ে সকলকেই চলে যেতে হবে সময়ের ব্যবধানে। জীবনে হয়তো

অনেক কিছু দেখব কিন্তু জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রেই আমাকে অনুপ্রেরণা যোগাবে ফেলে আসা দিনগুলি। হয়তো জীবনে অনেক জনের সাথে পরিচিত হব। কিন্তু এই ক্যাম্পাসের প্রিয়মুখগুলি সবসময় আমার অংশ হয়ে থাকবে। জীবনের শেষ লগ্নে পড়স্ত বিকেলে বুক ফুলিয়ে বলতে পারব আমি আসাদ ভাই, আল আমিন ভাই, আকাশ ভাই, স্বাধীন ভাই, হুদয় ভাই, কনক ভাই, রকি ভাই, অর্পন ভাই, রায়হান ভাইদের মতো কিছু ভাই পেয়েছিলাম। যারা আমার এই পথটাকে আরও সহজ করে দিয়েছিল। আপনারা হলেন ভাই, ইতিহাস। ইতিহাস সবাই হতে পারে না।

জীবনের চলার পথে অনেক কিছুর সম্মুখীন হবো কিন্তু সমসময় আমার অনুপ্রেরণা এই অঙ্গন। আদি থেকে অন্ত এ ক্যাম্পাসের প্রত্যেকটা মুখ এখানে একটি পরিবার। কথায় বলে নাড়ির টান ছিন করা যায় না। টেকনিক্যাল আমার নাড়ি। এ সম্পর্ক ছিল, আছে, থাকবে। কলেজ সবসময় আমাকে আনন্দ দেবে। কিন্তু আফসোস শেষটা হয়তো আরও ভালো হলেও হতো পারতো।

পরিশেষে এই ক্যাম্পাস হয়তো অনেক জিনিয়াস জন্ম দেবে। আমাদের থেকে অনেক ভালো কাউকে পাবে, অনেক খারাপ কাউকে পাবে কিন্তু আমাদের মতো আর কাউকে পাবে নাহ। ভালো থেকো প্রিয় ক্যাম্পাস।

জয়তু টেকনিক্যাল।



















সমাপ্তি